কবি সুকান্ত

অশোক ভট্টাচার্য

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা ৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

চিত্রশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৫

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

রবিস্মরণে

বাবা ও মা-র স্মরণে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তা ইদানীংকার বাংলা সাহিত্য-জগতের একটি লক্ষণীয় ঘটনা। কবিতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন সম্পর্কে কৌতূহলও অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে অনেক দিন। তবু একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনী বেরোতে এতো বিলম্ব হবার কারণ এই যে তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও তা বিভিন্ন কর্মতৎপরতা ও মানসিক বিবর্তনে পরিপূর্ণ। সুকান্তর সাহিত্যিক বন্ধুদের কারো পক্ষেই একক ভাবে তাই তাঁর জীবনের সকল দিককে উন্মোচিত করা সম্ভব হয় নি—বিশেষত পারিবারিক ঘটনাবলী জানা তাঁদের পক্ষে ছিল আয়াসসাধ্য। লেখক একাধারে কবির অনুজ এবং তাঁর বন্ধুদের স্নেহভাজন হওয়ায় একাজে অগ্রসর হতে পেরেছে।

সুকান্তর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু শ্রীঅরুণাচল বসু ও শ্রীভূপেন ভট্টাচার্যের অশেষ সাহায্যে এবং শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়. শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য ও শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের উপদেশে এ লেখা সম্পূর্ণ করা গেল। 'কবি সুকান্ত'র খসড়া শ্রীঅনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত মাসিক 'নতুন সাহিত্যে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সুকান্তর জন্ম ও আবাসগৃহের ফোটো ছুটি তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীসমীর সিংহ। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার কথা ভেবে এঁদের ধন্যবাদ জানান থেকে বিরত হলাম।

অশোক ভট্টাচার্য

চেহারার এমন বৈশিষ্ট্য ছিল না যার সাহায্যে দশজনের মধ্যে থেকে এক নজরে আলাদা করে ফেলা যেত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। শ্যামবর্ণের দোহারা গড়নের মাঝারি সাইজের মানুষ। মাথায় ছিল একরাশ ঘন চুল—যেন তারই ভারে মাথাটা ঝুঁকে পড়তো সামনের দিকে। পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট—তার আবার হাতা দুটো থাকতো কনুই পর্যন্ত গোটানো। কাপড়ের কোঁচাটা বাঁ হাতে ধরে, অথবা মালকোঁচা দিয়ে, রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে হেঁটে চলা ছিল তাঁর অভ্যাস।

ঠিক এই পোশাকে, এইভাবে, বেলেঘাটার ধূলি-ধূসর পথে অনেকেই দেখে থাকবেন সুকান্তকে। কখনো তাঁর হাতে থাকতো ভাঁজ করা কাগজ—কখনও বা এক আধখানা বই। চলতে চলতে যেন আপন মনে কথা বলে উঠতেন—হঠাৎ কিসে উদ্দীপ্ত হয়ে মাথার ওপর তুলে ধরতেন ডান হাতের তর্জনী—যেন কাকে শাসাচ্ছেন এমনি ভাব। আবার হয়তো কখনো দেখা যেত অন্যমনস্ক হাসি ফুটে রয়েছে তাঁর মুখে।

আপাত চাকচিক্যহীন চেহারায় সুকান্তর ছিল একটা অনমনীয়তা। চলা ফেরার ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠতো তাঁর মনের ঋজুভাব। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল সাধারণত কোমল। মৃদু হেসে, মুখ তুলে, চোখের ওপর চোখ রেখে, আস্তে আস্তে কথা বলতেন তিনি। প্রতিটি কথা যেন স্পর্শ করতো শ্রোতাকে—এমনই বিশিষ্ট ছিল তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটি। আর সেই দীর্ঘ ঘন পল্লবে ঘেরা বড় বড় উজ্জ্বল চোখের কালো মণিদুটিও যেন একই সঙ্গে কথা বলতো নিঃশব্দে।

লাজুক প্রকৃতির মানুষ। নিজে থেকে উপযাচক হয়ে কারো কাছে হাজির হওয়া ছিল স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষত নিজের প্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতা—সেতো চূড়ান্ত নির্লজ্জ-তারই নামান্তর। আসলে তিনি যেন নিজের কথা নিজেই ভাবতে ছিলেন নারাজ।

অথচ ঠিক আত্মভোলাও বলা যায় না। নিদারুণ রাগে জ্ঞানশূন্য হতে দেখা গেছে সুকান্তকে। একবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সত্যি সত্যি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তিনি। বন্ধুটির অপরাধ—সে রসিকতার নামে বাড়াবাড়ি রকমের দুর্ব্যবহার করেছে—অপমান করেছে তাঁর প্রিয় সংগঠনের। ছোট্ট এতটুকু কোন ঘটনায় তাঁর মনে ঘা লাগতো। অভিমানে মুখ লাল হয়ে উঠতো। এ অভিমান ছিল তাঁর চরিত্রগত।

শুনেছি কোন্ ছেলেবেলায় সুকান্তর বাবা তাঁকে আর তাঁর ছোট ভাইকে বাসে চড়িয়ে কালীঘাটে মামার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাসের নিয়ম অনুসারে তখন মাথাপিছু একটি শিশু

যেতে পারতো বিনা টিকিটে আর দুটি হলেই দিতে হত একটা টিকিটের দাম। তাই হেসে, শিশু সুকান্তকে দেখিয়া কনডাক্টরকে বাবা বলেছিলেন,—মনে কর না বাপু এ ছেলেটি অন্য একজনের সঙ্গে যাচ্ছে। এতে মহা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সুকান্ত। তখনই নেমে পড়েছিলেন বাস থেকে—সটান্ পদাতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন ঘরমুখো।

অথচ সুন্দর একটা পরিহাসপ্রিয়তা ছিল তাঁর মধ্যে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়তো তাঁর চমক লাগানো সরস কথাগুলি। মনে হত দিনের পর দিন এমনি হেসে এবং হাসিয়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে কিছুই না। আর সেই পরিহাসের ব্যাপারে কোনো বাদবিচার মানতেন না তিনি। মনে পড়ছে, বাড়ির বুড়ি ঝি লক্ষ্মীর মাকে সুর করে কীর্তন শোনাতেন প্রায়ই—যেখানে দেখিবি ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। সুরের মোহে কথাগুলি যে কোন পদকর্তার রচনা নয় তা বুঝতে পারতো না লক্ষ্মীর মা। সে ভাবে ঢুলু-ঢুলু হত আর সেই উপলক্ষে সবাই হেসে উঠতো উচ্ছল আনন্দে।

(এমনি সহজ আর সাধারণ মানুষ ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। ব্যবহারিক জীবনে এমন কোন হাবভাব তাঁর মধ্যে প্রকট ছিল না যার দ্বারা একজন বিশিষ্ট কবির স্ফূর্তি এক নজরেই ধরা পড়তে পারতো।)

একটি ব্যাপারেই কেবল কিছুটা স্বতন্ত্র আর অস্বাভাবিক মনে হত সুকান্তকে। সেটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, কাজের প্রতি

তাঁর নিষ্ঠা। কী কঠিন পরিশ্রম করতেন সুকান্ত তাঁর পার্টির জন্যে আজও হয়তো তা সহকর্মীদের অনেকের মনেই উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর রোগের ইতিহাসের সঙ্গে এই পরিশ্রমের ইতিহাসটাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোন্ সকালে কিছু না খেয়েই বেরিয়ে পড়তেন বাড়ি থেকে। তারপর সূর্য যখন পশ্চিমে বেশ খানিকটা হেলে পড়তো তখন ফিরতেন খাবার জন্যে। ঢেকে রাখা কিছু ঠাণ্ডা ভাত মুখে গুঁজে, দায় সেরে, আবার দ্বিতীয় দফায় কাজে বেরোতেন। ফিরতেন যখন তখন বাড়ির বেশির ভাগ মানুষই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পথে ঘাটে কিশোর সুকান্তর জন্যে নিশ্চয়ই কেউ তাঁর বৈকালিক আহার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো না। তাছাড়া এমন লাজুক ছিলেন যে অপরের কাছ থেকে চট করে খাবার গ্রহণ করতেও পারতেন না তিনি। এমনি ভাবে চলতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আর শুধু এটুকুই ছিল না পার্টির প্রতি তাঁর নিষ্ঠার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেবার চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে। ফেরার পথে পড়লেন অসুবিধায়। পকেটে কেবলমাত্র পার্টির জন্যে সংগৃহীত একটি টাকা। সারা পথে প্রায় কিছু না খেয়েই চলে এলেন কলকাতায়। তবুও সে টাকাটা কিছুতেই খরচ করলেন না। অথচ টাকাটি সুকান্ত তাঁর এক দাদার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং টাকাটা পূরণ করাও হয়তো অসম্ভব হত না। আসলে তাঁর কাছে পার্টির নামে নেওয়া টাকা ব্যক্তিস্বার্থে খরচ করাটা—তা সে যত প্রয়োজনেই হোক না কেন—নিতান্তই অপরাধ হিসাবে গণ্য হত।

কবি সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ঠিকমত বলতে গেলে হয় তো বলতে হয় সবখানি। তাঁর জীবনী লিখতে বসে তাই লিখতে হয় কমিউনিস্ট কর্মী সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট নেতা গাব্রিয়েল পেরির মতই তিনি অনুভব করেছিলেন সারা দিনের মধ্যে সময় বিশেষ মাত্র পার্টির কাজ করে আরব্ধ বিপ্লবকে সফল করা যাবে না। তাই তিনি অহোরাত্র পার্টির কাজ ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। পার্টির নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস ছিল তাঁর অকৃত্রিম।

কবি সুকান্তর জীবনী লিখতে গেলে আজ স্বভাবতই কর্মী সুকান্ত এসে হাজির হবেন তাঁর কবি জীবনের পরিপূরক হিসাবে। কিন্তু সেদিন—যে দিন তিনি বেঁচে ছিলেন—কবি সুকান্ত ছিলেন কর্মী সুকান্তরই পরিপূরক। এর ফলে তাঁর অনেক কবিতায় মায়াকভ্স্কির মতই যেন পার্টি বিশেষের আদর্শ বারংবার ঘোষিত হয়েছে। আবার ঠিক এই কারণেই কবি কিশোরের কবিতায় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হওয়াও সম্ভব হয়েছে—মূর্ত হয়েছে পৃথিবীর একটি নতুন চেতনা, নতুন বিশ্বাস।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা সুকান্তর কবিতার যে অন্তর্জ্বালা তাকে নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্যের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এমন অনেক দরিদ্র-মধ্যবিত্ত বাঙালী কবি আছেন বা ছিলেন যাঁরা সংগ্রামের ধার দিয়েও যাননি; বরং কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেছেন কেউ, কেউ মেঘলোকে উধাও হতে চেয়েছেন,

অথবা বিষাদ সায়রে ডুব সাঁতার কেটেছেন। তাই সন্দেহ হয় তাঁদের এই সমালোচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে সুকান্তর কাব্যকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র, কিন্তু সত্য প্রকাশিত হয়নি।

এই সব সমালোচকেরা যদি কিছুমাত্র সংস্কারমুক্ত হতেন তবে স্বীকার করতেন যে প্রতিটি কাব্য-প্রতিভাই স্বতন্ত্র চরিত্রের অধিকারী। আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি যে তার সমাজচেতনা ও মেজাজের ওপর নির্ভরশীল তা-ও তাঁরা মানতেন। তাই একথা যেমন গ্রহণ করা যায় না যে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের দরুন কবিমাত্রই বিপ্লবী হয়ে উঠবেন, তেমনই এও অনস্বীকার্য যে সচেতন কবি ব্যক্তিগত আথিক স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থেকেও বিপ্লববাদী হতে পারেন। তাই সুকান্তর বিপ্লববাদের এক মাত্র কিংবা মূল কারণ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে দায়ী করলে নিতান্তই এক যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান হবে। আসলে বিশেষ এক সমাজ ও যুগচেতনার অধিকারী হবার ক্ষমতাই যে তাঁকে শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দীর্ঘজীবন নয়। জীবনের সূচনাতেই শেষ। জীবনী লিখতে বসে মনে হচ্ছে কবিকিশোরের জীবন হল অনুভব করার বস্তু। এ জীবন সম্পর্কে জানার চেয়ে বোঝার বিষয় আছে বেশি। যে আবেগ নিয়ে শিশু সুকান্ত কবি সুকান্তে পরিণত হলেন— অথবা কবি সুকান্ত দেশপ্রেমিক ও কর্মী সুকান্তে আত্মপ্রকাশ করলেন, এখানে সেই আবেগকেই রূপদানের চেষ্টা করবো আমি। কেননা এতেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে তাঁর জীবন ও কাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা। তাঁর জীবনকে অনুসন্ধান করতে হবে পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক ও

রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে, সে পরিবেশ ছাড়িয়ে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে, কাজকে অতিক্রম করে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে।

এদিক থেকে মনে হয় কবি সুকান্তর প্রকৃত পরিচয় সব থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁরই একটি কবিতায়, যেখানে তিনি লিখছেন :

আমি এক ক্ষুধিত মজুর।

আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।

তবু সুকান্তর এই কাব্যিক অভিব্যক্তির পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যপূর্ণ; আপাত দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক হলেও বাস্তবে তা স্বাভাবিক আর যুক্তিযুক্ত

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম হয়েছিল ১৩৩৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ—মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কালীঘাট অঞ্চলের ৪২নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার একটি ছোট ঘরে; নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত।

পূর্ব-পুরুষ পূর্ববঙ্গের মানুষ। প্রথমে তাঁদের বাস ছিল ফরিদপুরের কোটালীপাড়ায়। তারপর কয়েক পুরুষ এসে বাস করেন মাদারীপুরে। এই ছোট মাদারীপুর শহরেই পিতা নিবারণচন্দ্র বাস করেছেন তাঁর শৈশবে ও প্রথম যৌবনে।

সুকান্তর বাবা ও জেঠামশাই বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের শৈশবকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে। এর কারণ ছিল সুকান্তর পিতামহ জগচ্চন্দ্রের অকালমৃত্যু। অকস্মাৎ যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন সুকান্তর বাবার বয়স ছিল মাত্র বছর দেড়েক আর জেঠামশায়ের বয়স সাত-আট।

এ হেন দুরবস্থার মধ্য দিয়েও পিতামহী তাঁর অসাধারণ মনোবলের সাহায্যে মানুষ করতে থাকেন তাঁর নাবালক সন্তান দুটিকে। মায়ের কাছে ছোট ভাইটিকে রেখে তের বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে, জননীর স্নেহচ্ছায়া পিছনে রেখে সংস্কৃত পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণচন্দ্র হাজির হয়েছিলেন বিক্রমপুরে। সেখানকার পাঠ শেষ করে ঢাকা ও কলকাতা থেকে উপাধি অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর

প্রভাব ছিল বিদ্যমান। নতুবা কেমন করে একটি নাবালক শিশুর পক্ষে সম্ভব হল সুদূর পূর্ব বাংলার ক্ষুদে এক শহর থেকে অসহায় অবস্থায় বেরিয়ে জনবহুল এই কলকাতা মহানগরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা? অমন কপর্দকহীন অবস্থায় শহরে পৌঁছেও স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর একটি বিরাট পরিবারকে প্রতিপালন করার পর, যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিস্তার করে, নিজের বাড়িতে শেষ জীবন অতিবাহিত করে গেছেন তিনি। তিনি ছিলেন যশস্বী বাগ্মী। তাঁর সংস্কৃত বাচন-ভঙ্গির জন্যে তিনি সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করে এসেছিলেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনী লিখতে বসে জেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনেতিহাস বিবৃত করার কারণ এই যে তিনিই একটি পশ্চাৎবর্তী গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পরিবারকে কলকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর তাতেই সম্ভব হয়েছিল নাগরিক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিকাশ। তাঁর বাবা কৈশোরে মার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হওয়ায় তেমন কোন উচ্চ উপাধি অর্জন করতে পারেননি। তবু তিনিও কলকাতায় অগ্রজের কাছে এসে নিজের উদ্যোগেই এক স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। অত্যন্ত নগণ্য অবস্থায় শুরু করে ক্রমে তিনি সারস্বত লাইব্রেরী নামক পুস্তক প্রকাশনীটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অগ্রজের সাহায্যে এই প্রকাশনীটিকে তিনি তৎকালীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশনীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুকান্তর বাবার চরিত্র সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। মানুষটি চিরকালই ছিলেন পরিশ্রমী, সৎ ও ভগবান

বিশ্বাসী। পূজার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল। অথচ ঠিক এতেই তাঁকে পরিষ্কার বোঝা যাবে না। চাপা প্রকৃতির মানুষ। তাই তাঁকে বুঝে ওঠাও ছিল কিছুটা দুষ্কর। কথা বলারও একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল তাঁর! তাঁর কথার সূক্ষ্ম কারুকর্ম শিল্পী মনের পরিচয় বহন করতো। হয়তো তিনি ছেলেদের কোন বিষয়ে কোন শিক্ষা দিতে চান। অমনি ধীরস্থির ভাবে শুরু করে দিতেন একটি গল্প। গল্পটির রসে মজে যেত সবাই কিন্তু তাঁর বক্তব্য শেষ পর্যন্ত কাহিল করে ফেলতো শ্রোতাদের। অথচ তার প্রতিবাদ করাও চলতো না—এমনি সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ম ছিল তাঁর সংস্কৃত, অথবা লোক-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত গল্পগুলি।

তাঁর স্বোপার্জিত জ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের প্রতি অনুরাগ বহু গুণীজনের শ্রদ্ধার্জন করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক ডঃ ভাগবত শাস্ত্রী তাঁকে বিদ্যাভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তাঁর যে গুণটি এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য তা হ'ল তাঁর শিল্পপ্রীতি। যৌবনে তিনি ছিলেন সৌখীন পুরুষ। নানা চিত্রে ঘর সাজানো বা পাঁচালীপাঠের মধ্যে তাঁর সেই শিল্পী মনের স্ফুরণ ঘটেছিল। তাঁর এই শিল্পী-সত্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় একাধিক সন্তানের ভিতর।

সুকান্তর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বাবা ও জেঠামশায়ের একান্নবর্তী পরিবারটির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। এ সময় বই-এর প্রকাশনীটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তা ছাড়া জেঠামশাই ও বাবার যজমানী আর পণ্ডিত বিদায় তখনকার দিনে নগণ্য ছিল না।

সে সময় তাঁরা বাগবাজারে নিবেদিতা লেনের একটি দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বিরাট বাড়িতে লোকজন ছিল যথেষ্ট। কেননা দেশের চেনাজানা মানুষেরা শহরে প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে এসে এখানেই উঠতেন প্রথমে। আর সামাজিকতায় উৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র ও নিবারণচন্দ্র তাঁদের সর্বদাই সাদরে গ্রহণ করতেন। তাই বাড়িটা থাকতো সরগরম। এই বাড়িতে শিশু সুকান্তর দিন কেটেছে কখনও ঠাকুরমার ঘরে কখনও বা রাণীদির কোলে। রাণীদি ছিলেন সুকান্তর জেঠতুত বোন আর বাড়ির একমাত্র কিশোরী। তাঁর কাছেই মনে হয় কবিতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন শিশু সুকান্ত। রাণীদির কণ্ঠস্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। শিশু সুকান্তকে কোলে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করার ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। তখন হয়তো এ-সব কবিতা শিশুমনে কাব্যের বীজ বুনেছিল। তা ছাড়া সুকান্তর মা সুনীতি দেবীও রামায়ণ-মহাভারত পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। অবসর সময় কাশীরাম আর কৃত্তিবাস ছিল তাঁর সঙ্গী। তাই বাংলার প্রায় সকল কবির প্রেরণা সেই রামায়ণ মহাভারত কবি সুকান্তরও কাব্যপ্রতিভার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।

সুকান্তর সুপণ্ডিত জেঠামশায়েরও ছিল সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। তিনি ছিলেন একটি সংস্কৃত সাহিত্যচক্রের কাণ্ডারী। সাহিত্য পিপাসু বিভিন্ন পণ্ডিতের নিয়মিত অধিবেশন বসতো তাঁর বাড়িতে। এই প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হল এর হিসাব-নিকাশের খাতাটা পর্যন্ত লেখা হত পদ্যে। হিসাবের খাতার প্রথম পাতায় লেখা ছিল এই শ্লোকটি ঃ

পদ্যগোষ্ঠীসদস্যানাম্ অন্যেষাং শুল্কদায়িনাম্।
পত্রিকাগ্রাহকানাঞ্চ নামধামাদি লিখ্যতে ॥

এই প্রাচীন পন্থী সাহিত্যসেবীদের পাশাপাশি বাড়িতে একটা নতুন দলও গড়ে উঠছিল। দলের পুরোধায় প্রথমে ছিলেন সুকান্তর এক দূর-সম্পর্কের কাকা, ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতকোত্তর ছাত্র সরোজ ভট্টাচার্য, এবং পরে জেঠতুত দাদা রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য। তখন বাংলা সাহিত্যের বুকে কল্লোল যুগের ঝড়। সে ঝড়ের গর্জনে কলেজে পড়া সাহিত্যামোদী যুবকদের মনও যে তোলপাড় হবে তা আর আশ্চর্য কী!

প্রত্যেকেই তাঁরা অল্পবিস্তর আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই সংস্কৃত-আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ বাড়িতে নতুন বাতাসের সঞ্চার করলেন। নিজেদের প্রচেষ্টায় বেশ একটা সাহিত্যিক পরিবেশ রচনাতেও সক্ষম হয়েছিলেন এঁরা। বাড়িতে প্রায়ই ছেলে-বুড়ো-মেয়েদের আসর বসতো। আর সেই আসরে মেজদা রাখালচন্দ্র নানা রসসাহিত্য পাঠ করে শোনাতেন। তাঁর পঠিত পুস্তকাবলীর মধ্যে ছিল শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' ইত্যাদি। এঁদের অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন 'রমলা' প্রণেতা মণীন্দ্রলাল বসু। তাঁরই বিখ্যাত গল্প 'সুকান্ত'র নাম অনুসারে কবি-কিশোরের নাম দিয়েছিলেন রাণীদি। তখন কে জানতো গল্পের নায়কের মতো যৌবনের সূচনাতেই ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটবে সুকান্তর!

ইতিমধ্যে একদিন বাগবাজার ছেড়ে বেলেঘাটার ৩৪ নম্বর হরমোহন ঘোষ লেনে নিজেদের বাড়িতে চলে এসেছে সমস্ত

পরিবারটি। আর এতদিনে কিছুটা বড়ও হয়ে উঠেছেন শিশু সুকান্ত। জীবনের চৌহদ্দী বাড়াবার চেষ্টাও চালিয়ে চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এরই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে একটা মজার কাণ্ড বাধিয়ে ছিলেন একদিন। এক পয়সার মুড়ি খাওয়ার ইচ্ছায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে একটি গিনি তুলে নিয়ে সটান্ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন পাড়ার জগার দোকানে। কিন্তু বরাত ছিল মন্দ তাই অব্যবসায়ী জগা চক্চকে পয়সা সুদ্ধ ক্ষুদে খদ্দেরটিকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল শাসকবর্গের কাছে।

আরও একটু বড় হয়ে, শিশু থেকে বালক বিশেষণের উপযুক্ত হয়ে, একদিন হঠাৎ কবিতা লিখে বসেছিলেন সুকান্ত। যতদূর জানা যায় তাতে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাকে বিশেষ মহৎ বলা চলে না। এই দু-ছত্রের কবিতাটির বিষয় ছিল কবির অনুজ প্রশান্ত। অবশ্য কবিতাটিতে অনুজের কোন মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়নি; ফলে স্বভাবতই কবিতা শুনে ক্ষেপে গিয়েছিল কবিতার নায়ক, নালিশ জানিয়েছিল বড়দের কাছে আর তাই দাদারা সকৌতুকে হয়তো ভর্ৎসনাও করেছিলেন কবিকে।

সুকান্তর বয়স যখন সাত-আট তখন একদিন বাড়িতে অকস্মাৎ শোকের ছায়া নামলো। রাণীদির অকস্মাৎ মৃত্যুই ছিল এর কারণ। সে মৃত্যুতে নতুন বাড়ির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হল সমস্ত পরিবারটির মধ্যে। জেঠামশাইরা বেলেঘাটা ছেড়ে উঠে গেলেন উত্তরপাড়ায়। ক্রমে সুকান্তর বাবা ও জেঠামশায়ের যুক্ত পরিবারটি পৃথক হল। আর যে পরিবেশে সুকান্তর জন্ম হয়েছিল সে পরিবেশটিও সহসাই নষ্ট হয়ে গেল। একদিন বেলেঘাটার নিজেদের বাড়ি ছেড়ে সুকান্তদের উঠতে হল গিয়ে কলেজ স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু এই অচেনা জায়গায় সমস্ত পরিবারটিই যেন হাঁপিয়ে উঠলো। তাই ছ-মাস পরে আবার ফিরে আশা হল বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনেরই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে।

অল্পদিনের মধ্যে জেঠাশাইরাও ফিরে এসেছিলেন তাঁদের হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়িতে। তখন কিছুদিন পরিবার দুটি পৃথক হয়েও কাছাকাছি বাস করতে লাগলো। দিনের মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসাও চললো অনেকবার। ঐ সময়, বয়স যখন ন-দশ বছর, প্রায়ই ছড়া লিখে চলেছেন সুকান্ত। যেমন :

বল দেখি জমিদারের কোনটি ধাম ?
জমিদারের দুই ছেলে রাম শ্যাম।

রাম বড় ভালো ছেলে পাঠশালা যায়
শ্যাম শুধু ঘরে বসে দুধ ভাত খায়।

রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন,
দুই বোন রমা রাণী
সবে করে কানাকানি
দুইজনের হবে ভালো
করিবে সে ঘর আলো সীতার মতন।

ছড়া লেখার প্রেরণা জুটেছিল যোগীন সরকার, সুনির্মল বসু প্রমুখ লেখকদের ছড়ার বই থেকে। সুকান্তর বৈমাত্রেয় বড় ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন কলেজ স্ট্রীটের একটি বই-এর দোকানের মালিক। সেই সূত্রেই এ ধরণের অনেক ছোটদের বই বাড়িতে এসে জমতো। আর সেগুলির সদ্ব্যবহার করতেন শিশু সুকান্ত।

ছড়া লিখে শিশুকবি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন বাড়ির সকলের কাছে। একজন তো ক্ষুদে কবিকে নিয়ে হাজির হলেন জেঠামশায়ের সামনে। তিনিও সেদিন শিশুকবির প্রতিভা দেখে যথেষ্ঠ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আর সুকান্তর জেঠাতুত বড়দাদা গোপাল ভট্টাচার্য তো রোজ কাজে বেরোবার আগে এ বাড়িতে এসে হাততালি দিতে দিতে আবৃত্তি করে যেতেন—'রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন'।......

সুকান্তর শৈশবের আর একটি রচনাও প্রিয় ছিল এই

মনখোলা মানুষটির। সেটি একটি গান। তার শেষ দুটি মাত্র পংক্তি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা গেছে :

তোমার মহিমা কত কব আর
এইখানে গান শেষ আমার।

এর পর প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আরও নানা রকম কাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে চললেন সুকান্ত। কোন দিন তিনি কাব্যরূপ দিয়ে বসলেন কথামালার 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়া ছিল' গল্পটিকে। আবার অন্য আর একদিন হয়তো নিতান্তই দুষ্টুমি করে তাঁদের দোকানের জনৈক কর্মচারীর উদ্দেশে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছিলেন—কালীরতন চাঁদবদন।

এরই মধ্যে একদিন পাড়ার মাস্টারমশাই অহীনবাবু সুকান্ত আর তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে ভর্তি করে দিয়েছিলেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কমলা বিদ্যামন্দিরে। এখানে বেশ মনোযোগের সঙ্গেই পড়াশোনা করতেন সুকান্ত। ভালো আর মেধাবী ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট স্নেহলাভও করেছিলেন তিনি শিক্ষকদের কাছ থেকে। সহাপাঠী বন্ধু শৈলেন সরকার তাঁর একটি নিবন্ধে কবির সেই ছাত্র-জীবনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

"প্রাইমারী স্কুলেই সুকান্তর সঙ্গে আমার পরিচয়। ও ছিল তথাকথিত ভালো ছেলেদের একজন। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার আগ্রহও আমার ছিল সেই জন্যে—সাধারণত যেমন হয়ে থাকে।

একটা ব্যাপার বরাবরই লক্ষ্য করেছি। পরীক্ষার শেষে

মাস্টারমশাইরা বলতেন, বাংলা যদি কেউ লিখতে পারে তো সে সুকান্ত। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই ওকে আগ্রহান্বিত দেখেছি এবং ভালো রচনা লিখতে পারার প্রশংসাটাও ছিল ওর একার পাওনা। বাইরের বই যাকে বলে তা সুকান্ত পড়তো প্রচুর। একটা ঘটনা উল্লেখ করলে এই পঠনকার্যের দ্রুততা বোঝা যাবে। হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে যখন পড়ি, একখণ্ড 'পথের পাঁচালী' ও আমার হাতে দিয়েছিল। পড়া শেষ করে ফিরিয়ে যেদিন দিলাম সুকান্ত মন্তব্য করেছিল, 'ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সমান আদরে এ বই বাংলার ঘরে ঘরে রাখা উচিত!' এর আগেই বঙ্কিম শেষ হয়ে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথও আরম্ভ করেছে।"

প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সাহিত্যিক সুকান্তর বাইরের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁরই প্রেরণায় আর পরিচালনায় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা মিলে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বের করেছিল। সুকান্ত এই পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'সঞ্চয়'। এতে তিনি একটি ছোট হাসির গল্প লিখেছিলেন। প্রথম বয়সে সুকান্ত গদ্যলেখা লিখতেন খুব। তার মধ্যে ছিল বেশির ভাগ গল্প আর তা ছাড়া বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের জীবনী। তৎকালীন শিশু-পত্রিকা বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিখা'য় যে লেখাটি তাঁর প্রথম ছাপা হয়েছিল তা বিবেকানন্দের জীবনী। ঐ 'শিখা' পত্রিকাতেই বালক বয়সে কবির কিছু গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়। কথাসাহিত্য ভিন্ন নাটকের প্রতি সুকান্তর যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল তারও সূত্রপাত দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়েই। এখানে একবার ছোটরা

'ধ্রুব' নাটিকা অভিনয় করে। সে অভিনয়ে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সুকান্ত।

সুকান্তর মা ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন একদিন। তাঁর অসুখ ছোট পরিবারটিতে বিপর্যয় আনলো। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে দাদামশাই এসে মা ও ছেলেদের নিয়ে গেলেন তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে।

এই কালীঘাটের বাড়িটির সঙ্গে কবির একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এ বাড়ির পরিবেশও ছিল স্বতন্ত্র। একটি মস্ত ঘরে খাটের ওপরে স্থির হয়ে শ্মশ্রু-মণ্ডিত গম্ভীর মুখে বসে থাকতেন দাদামশাই—যেন পুরাকালের কোন ঋষি। তিনি কথা বলতেন কম। আর যখন বলতেন তখন বেশ স্পষ্টভাবেই—হয়তো কিছুটা উগ্রভাবেই বলতেন। তাঁর ঘরে সাজানো থাকতো বিভিন্ন বিষয়ের মোটামোটা ইংরেজি বই। সে-গুলির মধ্যে আজও যা অবশিষ্ট আছে তার ভেতর দেখা যায় দামী সংস্করণের 'বুক অব নলেজ' আর কেরোর জ্যোতিষীর বই। দাদামশায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত প্রাচীন সংস্কার ছিল না মোটেই; যদিও তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বংশেরই সন্তান। তাই মা-ও ছিলেন নাগরিক সভ্যতার আলোয় কিছুটা সৌখিন।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন সুকান্তর দিদিমা। কী গভীরভাবেই যে তিনি মানুষকে ভালবাসতেন! তাঁকে অজাতশত্রু বলা চলে। তাঁর কাছ থেকে যেমন কেউ কোনদিন কারও নিন্দা শোনেনি, তেমনই তাঁকেও যে কেউ নিন্দা করেছে এমন জানা

যায় না। সবাই তাঁকে কী যে ভালোবাসতো তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি কানে খাটো ছিলেন। তাই তাঁর মাথা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো দশজনের মধ্যে। কাজের বাড়িতে তিনি ছিলেন প্রাণ।

সংস্কারহীন মন পাওয়ার দিক থেকে সুকান্ত হয়তো কিছুটা ঋণী তাঁর দাদামশায়ের কাছে। কিন্তু মানুষকে ভালবাসতে শেখা যে দিদিমার কাছ থেকেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দিদিমা ভিখিরির ছেলেকেও কোলে তুলে নাক-মুখ পরিষ্কার করে দিতেন।

এ বাড়ির গম্ভীর পরিবেশে যেন ছন্দপতনের মতোই ছিলেন সুকান্তর ছোট মামা বিমল তাঁর শৈশবে। এই হয়তো গুলি খেলছেন অথবা লাট্টু ঘোরাচ্ছেন মাঠে কিংবা ঘুড়ি ওড়াতে সোজা উঠে গেছেন ছাদে। তিনি ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে আর সুকান্তর সমবয়সী। এখানে এসে হাজির হতেন সুকান্তর বড় মাসিমার সঙ্গে মাসতুত ভাই ভূপেনও। তখন তিনজনের একটি চক্র গড়ে উঠতো। আর তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে এক আধটা নাটকও অভিনীত হত বাড়িরই মস্ত রান্না ঘরে স্টেজ বেঁধে। একটি নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—'বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়'। নাটকটির পরিচালক ও লেখক ছিলেন সুকান্ত।

·

প্রথম দফায় মধুপুর থেকে হাওয়া বদল করে মার অসুখ কমলো। দাদামশাই পূর্ণবিশ্রামের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু তাতে সমস্ত পরিবারটিই অচল হয়ে পড়ায় সে ব্যবস্থা

দীর্ঘ দিন স্থায়ী রাখা অসম্ভব হল। কাজেই সুকান্তর মাকে ছেলেদের নিয়ে আবার বেলেঘাঘাটায় ফিরে আসতে হল—বিশ্বাস নার্শারী লেনের একটা একতলা বাড়িতে।

কিছু দিনের মধ্যে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিশিষ্ট:চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়েও সারলো না দুরন্ত ক্যানসার রোগ। তবু তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁকে ফের মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হল; আর সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য সুকান্ত ছিলেন তাঁর জেঠাইমার কাছে। তাই মা-র মৃত্যুর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেনি। কিন্তু মাকে হারিয়ে অন্য ভায়েরা কলকাতায় ফিরলে সেই ছন্নছাড়া সংসারে এসে এক শ্বাসরোধকারী শূন্যতার মধ্যে কিশোর সুকান্ত অনুভব করতে পারলেন তাঁর জীবনের এই অপূরণীয় ক্ষতিকে। অন্য কোনো নারীর অনুপস্থিতিতে কর্ত্রীহারা পরিবারটিও হয়ে দাঁড়াল মেস বাড়ির সামিল। বড়রা যে যার কাজে বেরিয়ে গেলে সুকান্ত আর তার ছোট ভাই কটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতো সারাদিনের স্নেহমমতাহীন রুক্ষতা।

একটি ঘটনার উল্লেখে তখনকার অসহায় দিনগুলোর হয়তো যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে। সুকান্তদের বাড়ির পিছনে ছিল ভুতুড়ে এক পোড়ো বাড়ি। সে বাড়িটি তখন প্রায়ই হত তাদের কৈশোরিক অভিযানের রোমাঞ্চকর লক্ষ্য। সে বাড়ির জঙ্গলাকীর্ণ আঙিনা থেকে সুকান্তর অনুজ একদিন আবিষ্কার করলো অচেনা এক মূল। কিন্তু মূলটি কোন্ জাতের—এই নিয়ে বাঁধলো তুমুল তর্ক। আর তর্কে জেতবার শিশুসুলভ

বাসনায় ছোট ভাইটি হঠাৎ তাতে কামড় দিয়ে বসলে তার জিভ আর ঠোঁট উঠলো ফুলে। তখন প্রমাণ পাওয়া গেল মুলটা নিতান্ত অসভ্য আর বুনো। গোত্রহীন এই মুলটার একটা নামাকরণ করলেন সুকান্ত—কচ্‌ালবাদা—অর্থাৎ একাধারে কচু, আলু এবং আদা।

এর কদিন পরেই সুকান্তরা ফিরে গিয়েছিলেন বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনের আগেকার বাড়িতে। এখানেও সেই একই বৈচিত্র্যহীন ধূসরতা। অতিরিক্ত আর যা জুটল সে কেবল পুরনো দিনের স্মৃতি আর তার হাহাকার। ঠিক এই মানসিক ও পারিবারিক পটভূমিকায়, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরবর্তী দিনগুলির নির্জন অবসরে সুকান্তর মন হঠাৎ-ই যেন দ্রুত এক পরিণতির দিকে ছুটে চললো। সে মনের যথাযথ প্রকাশ ঘটতে থাকলো তাঁর রচনায়; দিনে দিনে গদ্যে-পদ্যে ভরে উঠলো একটা বাঁধানো খাতার পাতা। বেদনা আর বিধুরতায় দ্রব হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে তাঁর লেখা শৈশব থেকে উত্তীর্ণ হল কৈশোরের স্বভাব-সুলভ বিষাদে। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ প্রভাবে কবিতা অকালেই হল জীবনের প্রতি হতাশ ঔদাস্যে আচ্ছন্ন। সুকান্ত লিখলেন :

হে পৃথিবী আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায় ;……
                বিস্মৃত শৈশবে
যে আঁধার ছিল চারিভিতে
তারে কি নিভৃতে

আবার আপন করে পাব
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যাব,
স্মৃতির মর্মরে ?
প্রভাত পাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান
তার আজ তিক্ত অবসান।

সুকান্তর মন স্বভাবতই ছিল অন্তর্মুখী। দশ-এগারো বছর বয়সে ছেলেরা যখন দল বেঁধে হল্লা করে, কিংবা ফুটবলের পিছনে ছুটে শারীরিক ভাবে বেড়ে ওঠে, তখন তাঁর বিচ্ছেদ-বিধুর নিঃসঙ্গ হৃদয় বাঁধানো খাতাটির পাতায় পাতায় মুক্তি খুঁজছিল। ভাষা দিয়ে বাঁধতে চাইছিল মনের গভীরতম কেন্দ্রে সদ্যোজাত, অর্ধস্ফুট ভাবকে, রূপ দিতে চেষ্টা করছিল সূক্ষ্ম অনুভূতির। সুকান্তর তখনকার মানসিক অবস্থার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্রে। এটি কোন এক রাখাল বালকের কাহিনী; অতি সরল আর তাৎপর্যপূর্ণ এর আখ্যানভাগ :

'সূর্য যখন লাল টুক্‌টুকে হয়ে দেখা দেয় ভোর বেলায়, রাখাল ছেলে তখন গোরু নিয়ে যায় মাঠে। আর সাঝেঁর বেলায় যখন সূর্য ডুবে যায় বনের পিছনে, তখন তাকে দেখা যায় ফেরার পথে। একই পথে তার নিত্য যাওয়া-আসা। বনের পথ দিয়ে সে যায় নদীর ধারে সবুজ মাঠে,—গোরুগুলো সেখানেই চরে বেড়ায়। আর সে বসে থাকে গাছের ছায়ায় বাঁশিটি হাতে নিয়ে। চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুণতে গুণতে কখন যেন বাঁশিটিকে তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়। আর সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচিরমিচির করে তাদের আনন্দ জানায়

এক দিন দোয়েল পাখি তাকে ডেকে বলে,

(গান) ও ভাই রাখাল ছেলে

এমন সুরের সোনা বল কোথায় পেলে ?

আমি যে রোজ সাঁজ-সকালে

বসে থাকি গাছের ডালে,

তোমার বাঁশির সুরেতে প্রাণ দিই ঢেলে ॥

তোমার বাঁশির সুর যেন গো নির্ঝরিণী,

তাই শোনে রোজ পিছন হতে বন-হরিণী,

চুপি চুপি আড়াল থেকে

সে যায় গো তোমায় দেখে,

অবাক হয়ে দেখে তোমায় নয়ন মেলে ॥

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে দেখে সত্যিই এক দুষ্টু হরিণী লতাগুল্মের আড়াল থেকে মুখ বার করে অমিমেষ নয়নে চেয়ে আছে তারই দিকে।

সে তাকে বললে—

(গান) ওগো বনের হরিণী

তুমি রইলে কেন দূরে দূরে,

বিভোর হয়ে বাঁশির সুরে,

আমি তো কাছে এসে বসতে তোমায় নিষেধ করিনি।'

তারপর ? রোজই সেই হরিণী রাখাল ছেলের পাশে এসে শুনতে থাকলো তার বাঁশি। কিন্তু মা-হরিণী, বারবার নিষেধ করলো অবোধ শিশুকে। কেননা সে তো তার অভিজ্ঞতায় জানে মানুষ কী নিষ্ঠুর জীব! হরিণ শিশু মা-র বারণ শুনলো না, সে যে

নতুন এক চোখে দেখেছে রাখাল ছেলেকে। তাই মাকে সে বললে, ও মানুষ নয় মা, রাখাল ছেলে।

এমনি করে চলছিল তাদের দিন। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন দেখা দিল মানুষের লোভ। শিকারী এসে তার নিষ্ঠুর হাতে রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে আবিষ্ট সেই শিশু-হরিণীকে করলো হত্যা।

বনের অবোধ পশু জীবন দিয়ে তার ভুল বুঝলো। সে তখন রাখাল ছেলেকে বললে—

'তোমার বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি বোধ হয় মানুষ বলেই আমার মৃত্যুর কারণ হলে। তবু তোমায় মিনতি করছি—

(গান) বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণ কালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।...

ধীরে ধীরে বাঁশি শুনতে শুনতে হরিণীর মৃত্যু হলো। সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখ পেল।

সে তখন কেঁদে বললে—

বিদায় দাওগো বনের পাখি,
বিদায় নদীর ধার,
সাথীকে হারিয়ে আমার
বাঁচা হল ভার।
আর কখনো হেথায় আমি
বাজাবো না এমন বাঁশি

আবার আমার বাঁশি শুনে
মরণ হবে কার।

বনের পাখি, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি করলো—তুমি যেওনা।

যেয়ো নাকো রাখাল ছেলে
আমাদেরকে ছেড়ে
তুমি গেলে বনের হাসি
মরণ নেবে কেড়ে।
হরিণীর মরণের তরে
কে কোথায় আর বিলাপ করে—
ক্ষণিকের এই ব্যথা তোমার
আপনি যাবে সেরে।

দূর থেকে শুধু রাখাল ছেলে বলে গেল—

ডেকো না গো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ বাঁশির খেলা॥'

এ বেদনার উৎস কি কেবল মাত্র কোন কল্পিত শিশু-হরিণীর মৃত্যু? না, বরং এর পিছনে পরিস্ফুট একটি ব্যথিত হৃদয়, যা বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার অসহায়তার পরিচয় পেয়েছে, অথচ নিজের অভিজ্ঞতায় মৃত্যুর আকস্মিক প্রকৃতিকে চিনতে শেখেনি।

'রাখাল ছেলে' ছাড়া এই খাতাটির মধ্যে ছিল আরও দুটি

গীতিচিত্র, 'মধুমালতী' ও 'সূর্য-প্রণাম'। 'সূর্য-প্রণাম' লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ; 'অভিযান' বই-এ এটি প্রকাশিত হয়েছে। 'মধুমালতী' দুটি কিশোর কিশোরীর মুগ্ধ প্রেমের কাহিনী। এ রচনাটি খাতা থেকে উধাও হয়ে গেছে ; অর্থাৎ কবি এটি কেটে যাকে পড়তে দিয়েছিলেন তিনি আর ফেরত দেননি। এ ছাড়া একটি রোমাঞ্চকর গদ্য নাটকও স্থান পেয়েছে এই খাতায়। আসলে সুকান্তর প্রায় দুটি বছরের সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে খাতাটির পাতায় পাতায়। কাব্য ও সাহিত্য সাধনায় নিবিড় এই দিনগুলির বিভিন্ন রচনায় তাঁর নানা মেজাজ ধরা পড়েছে। কোথাও ছড়ার চটুল ছন্দে নেচে উঠেছে তার কিশোর মন, তিনি লিখছেন :

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
  এমনি সে পালোয়ান,
এক দিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
  'এক্ষুনি আলো আন।'
কী বিপদ তা হলে
আলো তার না হলে
  মার খাবো আমরা ?
দিলে পরে উত্তর
বলে রেগে 'ধুত্তোর
  যত সব দামড়া।'

কেঁদে বলি শ্রীপদে
'ঘোচাও এ বিপদে—
অক্ষম আমাদের।'
হেসে বলে শ্যামদা
'নিয়ে আয় রামদা
ধুবড়ির রামাদের।'

কিংবা

বাড়ি কোন গাঁয়ে?
বাড়ি বনগাঁয়।
ছেলে কাহাদের
ছেলে সাহাদের।
চল আমরা
পাড়ি আমড়া—

আবার অন্যত্র কোথাও বা চোখে পড়ে কয়েক ছত্র গদ্য লেখা। সে লেখায় আঁকা হয়েছে সাঁওতাল পরগনার নিসর্গচিত্র, ভ্রমণের মধুর স্মৃতি—

'সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, ধারোয়ার বুকে তারই কালো ছায়া। নিমন্ত্রিতের মত নিঃশব্দে প্রতিটি নক্ষত্র জড়ো হল আকাশের আসরে। কোন্-এক অদৃশ্য কোণ থেকে বকেরা উড়ে এল, মিলিয়ে গেল পিছনে, কিছুক্ষণ আকাশকে আলোড়িত করে। তৃতীয়ার তন্বী চাঁদের আলো নদীর ধারের বালিতে

লুটিয়ে পড়ে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রতিটি বালু-কণাকে। সেই চাঁদের আলো নিজের দেহে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকে বসে গল্প করছে; তাদের কথালাপে, উন্মুক্ত হাসিতে ধারোয়ার তীর মৃত্যু-গুঞ্জরণে মুখরিত। কিন্তু নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে। কারো হঠাৎ গাওয়া গানের কলিতে চমকে ওঠে সেখানকার সমাধি-গম্ভীর নিসর্গ। দূর থেকে ভেসে আসা তরুণীর কলহাস্যে সাড়া দেয় না এই তপস্যামগ্ন পারিপার্শ্ব।'

প্রকৃতি কিংবা ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা, এই ছিল সুকান্তর কৈশোরের প্রথম দিককার রচনার উপজীব্য। কিন্তু বাইরের জগতের আবেষ্টন আর যুদ্ধপূর্ব পৃথিবীর দারুণ অস্থিরতা তাঁর কোমল মনের ওপর অচিরেই দাগ কাটতে শুরু করলো। ফলে তাঁর কবি মনের যে পরিবর্তন ঘটতে থাকলো তার চিহ্নও ধরা পড়লো এই বাঁধানো খাতাটির পাতায়। তাঁর মন যেন ধাপে ধাপে, কিংবা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, লাফে লাফে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন কোন এক সুনির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে। চোদ্দ বয়সের সুকান্ত এক যায়গায় লিখলেন :

এতো দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
আজ চেয়ে দেখি শুধু নরক।
এতো আঘাত কি সইবে,
যদি না বাঁচি দৈবে?

সেদিনের পৃথিবীর অনিশ্চয়তার দীর্ঘ ছায়া যে কিশোর সুকান্তর ওপর এসে পড়েছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায় এই পংক্তি কটি থেকে। কিন্তু শুধু মাত্র অনিশ্চয়তাই নয়। যুদ্ধ তো স্বয়ং মৃত্যুরই দূত, আর তাকে এড়িয়ে পালাতে গেলেও পথ মেলে না। তাই পরের কবিতাটি হল :

দ্বারে মৃত্যু,
বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর ?
আমাদের এই পলায়ন
জেনেছে মরণ,
অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে
প্রস্থানের চেষ্টা হল মিছে।

(দেশে দেশে মানবতার বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয়েছিল সে দিন, তারই প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিজীবনকে ছাড়িয়ে এক বিশ্বজনীনতার ইঙ্গিত পেলেন সুকান্ত। ভাষা তাঁর বদল হয়ে গেল, নতুন বাক্যচয়নের মাধ্যমে, নতুন অভিজ্ঞতা বর্ণিত হল উন্মথিত:বেদনায় :

পৃথিবী বিকৃত-রাত্রে অভিশপ্ত প্রসব ব্যথায়
রুদ্ধশ্বাসে পানরত মেদসিক্ত সুরা।
আবার নতুন সৃষ্টি জন্ম নেবে সভ্যতার
অন্তিম ঔরসে—
নিত্য স্রোতে তাই শুধু কৃষ্ণপক্ষে

পাণ্ডুর পাণ্ডব ;

রক্তস্রাবে আরক্তিম অস্তগামী দিন।

সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সেই পুরনো খাতাটার 'উপসংহার' হল এই কবিতাটি।)

সুকান্তর সাহিত্যিক কার্যকলাপ শুধুমাত্র খাতার পাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন তিনি বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলে সপ্তমমানের ছাত্র। ক্লাসে বন্ধু পেয়েছেন সাহিত্যপাগল অরুণাচল বসুকে। অরুণাচলের সহযোগিতায় এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল শিক্ষক নবদ্বীপ দেবনাথের তত্ত্বাবধানে ক্লাসের ছেলেদের ছবি ও লেখা নিয়ে 'সপ্তমিকা' নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন সুকান্ত। পত্রিকাটির সংগঠকও ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বাড়িতে আসতেন শিল্পী বন্ধু শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন সরকার এবং আরও অনেকে। সুচারু রূপে অলংকৃত হয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ হওয়ার আগে সকলের মধ্যে একটা বেশ কর্মব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল কদিন।

দেশবন্ধু হাই স্কুলে সুকান্ত এমন কয়েকজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন যাঁরা সেই কিশোর বয়সে তাঁকে সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করতেন নিয়মিত। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্কুলের শিক্ষক নবদ্বীপ দেবনাথের নাম। শুধু স্কুলেই নয়, নবদ্বীপবাবুর বাড়িতেও প্রায়ই যেতেন সুকান্ত এবং সেই অপরিণত বয়সে কাব্য রচনায় নানা ভাবে অনুপ্রেরণা পেতেন তাঁর কাছ থেকে।

স্কুলের অপর একজন শিক্ষকও সুকান্তর কবিপ্রতিভা ও কাব্যবোধ সম্পর্কে ছিলেন নিঃসন্দেহ। সুকান্তর সঙ্গে এঁর প্রথম পরিচয়ের দিনে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল বলে শোনা যায়।

ক্লাসে সুকান্ত আর অরুণাচল বসতেন সাধারণত পিছনের বেঞ্চিতে। সেখানে প্রায়ই তাঁরা মশগুল থাকতেন নানা সাহিত্যিক আলোচনায়। এদিকে সুকান্ত আবার কানে শুনতেন কম। ক্লাস চলছে এমন সময় একদিন কথার উত্তেজনায় হঠাৎ চেঁচিয়ে অরুণাচল কী যেন বলছিলেন সুকান্তকে। ফলে ক্লাসের শিক্ষক দুজনকেই শাসন করতে এগিয়ে এলেন। তিনি যখন রোষকষায়িত লোচনে সুকান্তর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে ব্যস্ত তখন জনৈক সামনের বেঞ্চির ছাত্র তাঁকে জানালো, সুকান্ত কবি আর কানে কম শোনে। এ কথায় বিস্মিত হয়ে তিনি কবিকে একটা নির্দিষ্ট সময় টিচার রুমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। শঙ্কিত সুকান্ত দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলেন যথাকালে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর বিস্ময়ের আর অন্ত থাকলো না—সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুশিক্ষিত দীর্ঘকায় শিক্ষক তাঁর অজানিত ত্রুটি স্বীকার করছেন বালক কবির কাছে।

এই মান্য ভদ্রলোক পরবর্তী কালে, এমন কি শিক্ষকতা ছেড়ে দেবার পরও, তাঁর সহজাত সাহিত্যপ্রীতির দরুন অসমবয়সী সুকান্তর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন নিয়মিত। প্রায়ই টেনে নিয়ে গেছেন তাঁকে কাব্য ও সাহিত্য আলোচনার জন্যে।

দেশবন্ধু হাই স্কুলে সুকান্তর সব থেকে বড় লাভ অবশ্য অরুণাচল বসুর সঙ্গ। কেননা বন্ধুদের মধ্যে অরুণাচলই তাঁর কবিজীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর মধ্যে সুকান্ত পেলেন এমন একজন অন্তরঙ্গ সাথীকে যাঁর জীবনে শিল্প ও সাহিত্য কেবল

মাত্র সৌখিন আত্মবিনোদনের উপায় মাত্র ছিল না, ছিল আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। স্বভাবতই লাজুক সুকান্তর পক্ষে, যিনি তখন পর্যন্ত কবিতা ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রেই নিজেকে রেখেছেন সঙ্কুচিত ক'রে, এ হেন সমমর্মীকে সর্বদা নাগালের মধ্যে পাওয়াটা নেহাৎ নগণ্য ঘটনা ছিল না।

অরুণাচলেরা তখন থাকতেন বেলেঘাটার নির্জন এক পল্লীর ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাঁচিল ঘেরা একটি বাড়িতে। বাড়িটি ছিল মেয়েদের স্কুল। সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন অরুণাচলের মা সরলা দেবী। সরলা দেবী নিজেও ছিলেন একজন লেখিকা। তাই তাঁর কাছে সুকান্তর একটা বিশেষ আদর ছিল—তিনি কিশোর কবিকে স্নেহ করতেন মায়ের মতোই। অরুণাচলদের ঐ বাড়িতে বহু নির্জন সন্ধ্যা কাটিয়ে আসতেন সুকান্ত। গল্প করতেন অরুণাচলের মা-বাবার সঙ্গে, শুনতেন তাঁদের ফেলে আসা সুন্দরবনের দিনগুলির কথা, আর প্রায়ই মেতে উঠতেন নানা সাহিত্যিক খেলায়। হয়তো কোন গল্প শুরু করলেন সরলা দেবী, আর সে গল্প শেষ করার ভার দিলেন সুকান্তর ওপর; কিংবা এমন একটি কবিতা লিখলেন সুকান্ত ও অরুণাচল যার প্রতি স্তু-চরণের এক একটি হল এক এক জনের অবদান।

অরুণাচলের বাবা এই বাড়িটি ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলে সুকান্ত সে খবর চিঠি লিখে অরুণাচলকে যশোহরের ঠিকানায় জানিয়েছিলেন। সে চিঠির আংশিক উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে বাড়িটির স্মৃতি তাঁর মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল :

'...কিন্তু তুই বোধ হয় এই খবর এখনও পাসনি যে, তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত তৃণ-শ্যামল সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালী হাওয়ায় হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি। তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি, ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিস্প্রয়োজনীয়তায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা। তাঁর ঠিক গোপন জায়গাটাই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠলো প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত শত জনকোলাহল মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ নিঃস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মতো তার অবস্থা। তোদের অজস্র স্মৃতিতে চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদের স্পর্শের জন্য উন্মুখ, সেখানে এখনো বাতাসে বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির সৌরভ; কিন্তু সে আর কত দিন? তবু বাড়িটা যেন আজ তোদেরই ধ্যান করছে।'

এ চিঠি লেখা হয়েছিল ১৯৪১ সালের সূচনায়। উদ্ধৃতিটুকু থেকে অনুমান করা যায় সুকান্তর কিশোর মনে তখনো স্বাভাবিক ভাবালুতাই ছিল স্থায়ীভাব। ঠিক এই কারণেই অরুণাচলের সঙ্গ, তাঁর সহানুভূতিশীলা জননীর স্নেহ এবং তাঁদের বাড়ির পারিবারিক সারল্য সুকান্তকে এতখানি টেনেছিল।

এ ছাড়া অন্য যে কারণ ছিল এর পিছনে, তা হল তাঁর নিজের বাড়ির নীরস, স্নেহমায়া বিবর্জিত কেন্দ্রাতিগ পরিবেশ। বাড়িতে হয়তো কোনো বৃদ্ধা মহিলা রান্না করেন, খেতে দেন; বড়দের মধ্যে বাবা থাকেন সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে; আর সহোদর সুশীলও তখন তাঁর কলেজের পড়াশোনায় ব্যস্ত। সুতরাং সুকান্তর সংবেদনশীল মনকে বুঝবে, সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্রয় দেবে তাঁর কোমল কবিসত্তার, এমন কেউ থাকতো না কাছাকাছি। বরং বাড়ির আবহাওয়া ভারী করে ছিল প্রাচীন-পন্থী ভাবধারার বোঝা, যার পৃষ্ঠপোষক ততটা ছিলেন না সুকান্তর বাবা, যতটা তাঁদের প্রকাশনীর মূলকর্মচারী কালীরতন ভট্টাচার্য। অবশ্য এই গোঁড়ামির দিকটা বাদ দিলে কালীরতন কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে এ বাড়ির এক দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

সেই পণ্ডিতি-চালে-চলা বৈদিক-ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠায় পরিচালিত পরিবারে সব থেকে বেশি নজরে পড়তো পরিচ্ছন্নতা তথা সৌখিন কোনো অভিব্যক্তির অভাব। গৃহিণীহীন গৃহস্থালিতে অপরিচ্ছন্নতা স্বাভাবিক; আর তখন সুকান্তর বাবার আর্থিক সঙ্গতি, তদোপরি তাঁর নির্লিপ্ত মনোভাব, ছিল সবরকম সৌখিনতারই বিরোধী। অথচ শিল্পী-মন খোঁজে বাস্তব প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে অন্য কিছু, যা নিতান্ত মনেরই খোরাক জোটায়, তৃপ্ত করে অনাস্বাদিতপূর্ব কৌতূহল। তাই সুকান্ত নিজের বাড়িতে বাঁধা থাকতে চাইতেন না। তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতো সামনেই বৈমাত্রেয় বড় ভাই মনোমোহনের বাড়িতে। দাদা স্বয়ং ছিলেন শিল্পী; আর তাঁর বাড়িতে ছিল

শিল্পী-মনকে লালিত করার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ। সেখানে ঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকতো হাতে আঁকা নানান ছবি, গ্রামোফোন কিংবা রেডিওতে বাজতো গান, আর সব ছাড়িয়ে ছিল দাদার খেয়ালী মনের স্ফূর্তি, যা সুকান্তকে জোগাতো অফুরন্ত আনন্দ। তাছাড়া কথা বলার সঙ্গী পেয়ে বৌদিও তাঁকে স্নেহ করতেন যথেষ্ট। উপনয়ন উপলক্ষে ব্রহ্মচারী হবার আগে এটা-ওটা খেয়ে নেবার জন্যে একটা টাকা দিয়েছিলেন ইনি। সেই টাকাটায় বন্ধু ভূপেনের পরামর্শে মাথা জোড়া একরাশ চুলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চারটে পাশপোর্ট সাইজের ফোটো তুলিয়ে ছিলেন সুকান্ত, যার একটা হল গালে-হাত-দেয়া ছবিটি।

বিশেষ করে রেডিও-র সঙ্গে যেন এক নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সুকান্তর; হয়তো সেই বন্ধুত্বের দিনগুলিকে মনে রাখবার জন্যেই এক দিন লিখলেন,

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই 'রেডি' ও।

এই সময় 'গল্পদাদুর আসরে' রবীন্দ্রনাথ থেকে একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রপ্রয়াণ উপলক্ষে সুকান্তর নিজের লেখা একটা কবিতাও আর একদিন পঠিত হয়েছিল, সম্ভবত সেটাও পাঠ করেছিলেন স্বয়ং। যতদূর মনে হয় কবিতাটি হল 'পূর্বাভাসে' প্রকাশিত 'প্রথম বার্ষিকী'। তাছাড়া একবার রেডিও কর্তৃপক্ষ আসরের সভ্যদের লেখা গানে সুর দিয়ে প্রসিদ্ধ গায়কদের দিয়ে গাওয়াবার ব্যবস্থা করলে, তাতে প্রথম দফায় তিনটি গান গেয়ে ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এর প্রথম গানটির রচয়িতা ছিলেন সুকান্ত।

এত গেল রেডিও-র সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা। পরন্তু রেডিও সেট্‌টার গায়ে কান দিয়ে একান্ত-মনে গান ও নাটক শোনার তাঁর সেই বিশেষ ভঙ্গিটা আজও মনে পড়ে। সুকান্তর ছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত-অন্ত প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের বহু গান নির্ভুল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন তিনি। যদিও গলায় ছিল না সুরের আমেজ, তবু একাধারে বহু গানই গেয়ে যেতেন আপন মনে।

ছেলেবেলা থেকেই ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ সম্পর্কে নিজের একটা পরিষ্কার মতামত ছিল সুকান্তর। আর ছিল কার সঙ্গে কতটুকু মিশবেন, কটা কথা বলবেন সে ব্যাপারে পরিমিতি বোধ। তবু যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর গভীর আন্তরিকতা ও নিবিড় সখ্যতার সঙ্গে পরিচিত। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে বন্ধু ছিল মাত্র দু-এক জন। রবীন ঘোষকে মনে পড়ে সব থেকে আগে। রবীন ও সুকান্ত আরও কয়েক জনের সঙ্গে একযোগে নানারকম গঠন-মূলক কাজে সচেষ্ট হয়েছিলেন সে সময়। একটা নোংরা মাঠ পরিষ্কার করে ব্যাডমিণ্টন খেলার ক্লাব করেছিলেন তাঁরা। খেলাধুলার মধ্যে এই খেলাটিই ছিল সুকান্তর বিশেষ প্রিয়। ব্যাডমিণ্টন তিনি খেলতেনও ভালো। একবার শ্যামবাজারে জেঠাইমাদের বাড়িতে আয়োজিত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ান হয়ে সুকান্ত রূপোর মেডেল পেয়েছিলেন একটা। তা ছাড়া খেলতে পারতেন দাবা। সেটা পিতৃসূত্রে শেখা।

কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড়ির চওড়া বারান্দায় ছোট ছেলেদের পড়াবার জন্যে বিনা পয়সার কোচিং ক্লাস খুলেছিলেন সুকান্তরা। দু-তিন সপ্তাহ ধরে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে চলল শিক্ষকতার বিপুল প্রয়াস। এত উৎসাহ সত্ত্বেও যদি কেউ বলে তাতে পড়ার চেয়ে গণ্ডগোলই হত বেশী, তবে সে অপবাদকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া শক্ত। বেলেঘাটায় স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী নামে এখন যে পাঠাগারটি সগৌরবে চালু আছে, তার উদ্যোক্তাদেরও অন্যতম ছিলেন সুকান্ত। বাড়ির আলমারি ঘেঁটে আর আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে চেয়ে-চিন্তে বেশ কিছু সাহিত্যের বই ঐ পাঠাগারে দাতব্য করেছিলেন তিনি।

এই সব সৎকাজের মধ্যে সুকান্তর সমাজসেবামূলক মনোবৃত্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তবু 'দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা, আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা', এই যেন তখনকার সুকান্তর মানসিক অবস্থার প্রকৃত চেহারা। আশপাশের জীবনকে ছাড়িয়ে, এড়িয়ে বাঁধাধরা স্কুলের রুটিন, শুধু দুচোখ মেলে দুনিয়াকে চেনা, জানা আর খাতার পাতা ভরে লিখে চলা ছন্দোবদ্ধ কবিতা—এই হল তখন তাঁর প্রতিদিনের কাজের তালিকা।

অজানা কিছুর পিছনে ছুটে যাওয়া, অচেনা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা—প্রকৃতি ও তার বুকে লালিত মানুষের ব্যাপকজীবনকে জানার যে বাসনা তা সুকান্তর মনে ছিল আশৈশব। শেষ পর্যন্ত এক দিন বন্ধু রবীনকে নিয়ে বেরিয়েও পড়েছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়; হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে দু পাশের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শহর, স্টেশন ছাড়িয়ে হারিয়ে যেতে

চেয়েছিলেন সুদূরপ্রসারী ধানক্ষেতের ওপারে, যেখানে আকাশ স্পর্শ করেছে দিগন্তকে, কিংবা যেখানে মাথা-উঁচু-করা কালো পাহাড় ছুঁয়েছে শাদা মেঘের বুক।

আশা ছিল এ যাত্রা দীর্ঘ হবে। কিন্তু পকেটের অপ্রাচুর্য আর সঙ্গীর ভঙ্গুর মনোবল সে আশার মুখে কালি মাখালো। তিন দিন পরে ফিরে আসতে হল কলকাতায়। এদিকে সুকান্তর অগ্রজ সুশীলের অকস্মাৎ সেপ্‌টিক-জনিত অত্যন্ত অসুস্থতার দরুন বাড়িতে তখন মুখ দেখাবারও উপায় নেই। অগত্যা গেলেন অরুণাচলের বাড়িতে, কিন্তু সেখানে সুকান্তর দেখা হল না বন্ধুর সঙ্গে। তখন একটা খবর রেখে চললেন বেলেঘাটার বিখ্যাত গলায়দড়ির মাঠে, যে মাঠ জুড়ে এখন তৈরী হয়েছে নতুন লেক, নতুন পার্ক।

অরুণাচল খবর শুনেই ছুটলেন সেই কুখ্যাত মাঠের দিকে। কিন্তু সেখানে দেখতে পেলেন না সুকান্তকে। হতাশ হয়ে ফিরে আসবেন এমন সময় নজরে পড়লো গাছের একটা ডাল। না, গলায় দড়ি দেননি সুকান্ত, তিনি তখন সেই গাছের ডালে বসে গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। যাই হোক, বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে খুব অসুবিধা হয়নি অরুণাচলের, কারণ সুকান্ত গিয়েছিলেন নাকি শান্তিনিকেতন। সুতরাং কবি যদি যায় কবিগুরুর সদনে তাতে আর অপরাধ কি?

।োক স.কায়

সঠিক ভাবে বলতে গেলে সুকান্তর সত্যিকারের কবি জীবনের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। যদিও তখন বয়স মাত্র চোদ্দ-পনরো, তবু ঐ বয়সেই—হয়তো পারিবারিক বন্ধন-হীনতার জন্যেই—যেন বিশ্বের নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। তাই মহাযুদ্ধের আঘাত-সংকুল মৃত্যু-তাড়িত পরিবেশ তাঁকে করে তুলেছিল বিভীষিকাগ্রস্ত। সেদিন পুবে চীনাদের ওপর চলছে বর্বর জাপানী নির্যাতন, আর পশ্চিমে ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোকে তাদের অসহায়তার সুযোগে একে একে গ্রাস করে চলেছে হিটলারের ঝঞ্ঝা-বাহিনী—এক কথায় সমগ্র মানবতাই যেন নিদারুণ পরীক্ষার সম্মুখীন। ভারতবর্ষের মাটিতে অবশ্য যুদ্ধের তাণ্ডব তখনো শুরু হয়নি; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সুকান্তর কল্পনাপ্রবণ মনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় এনেছিল। ১৯৪০-র শেষের দিকে লেখা কয়েকটি কবিতায় তাঁর তখনকার মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থৈর্যের আভাস পাওয়া যায়:

দূর পূর্বাকাশে
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ
বিস্ফারিত হিংস্র বেদনায়।

অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান·
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোনিত প্রপাত।
[পূর্বাভাস : ১৯।৮।৪০]

ভয়ার্ত শোনিত চক্ষে নামে কালো ছায়া
রক্তাক্ত ঝটিকা আনে মূর্ত-শিহরণ
দিক্‌প্রান্তে শোকাতুরা হাসে ক্রূর হাসি ;
রোগগ্রস্ত সন্তানের অদ্ভুত মরণ।”
[নিবৃত্তির পূর্বে : ২৪।৯।৪০]

কেঁদেছিল পৃথিবীর বুক :
গোপনে নির্জনে
ধাবমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের কাছে
পেয়েছিল অতীত বারতা ?
মেরুদণ্ড জীর্ণ তবু বিকৃত ব্যথায়
বারবার আর্তনাদ করে
আহত বিক্ষত দেহ মুমূর্ষু চঞ্চল,
তবুও বিরাম কোথা ব্যগ্র আঘাতের।
[পরাভব : ২৮।৯।৪০]

আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায় পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে স্বয়ং ব্যথিত সুকান্তর একাত্মতা নিবিড় ভাবে অনুভব করা যায় কবিতা কটির ছত্রে ছত্রে।

'পূর্বাভাসে' প্রকাশিত এ সব কবিতায় আপাত নৈরাশ্যকে ছাড়িয়ে অপর একটি মনোভাবও খুবই স্পষ্ট—তা হল জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। সুকান্তর কবি জীবনের প্রথম প্রত্যুষ থেকেই দেখা যায় মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কবিতায়। এর জন্যে হয়ত নাগরিক জীবন অনেকাংশে দায়ী। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল তাঁর সহজাত জীবনবোধ। এই জীবনবোধ চূড়ান্ত দুর্দিনেও অপরাহত রেখেছিল সুকান্তকে।

সেই সংকটকালে সুকান্তর যাত্রাপথে সব থেকে বড় অবলম্বন হয়ে দেখা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমনিতেই আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন তিনি—যার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত কবি জীবনে চারটি কবিতা এবং একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন কবিগুরুর উদ্দেশে। স্বভাবতই এ সময় মহাকবির সমসাময়িক রচনার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন সুকান্ত। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণাসমূহ—বিশেষ করে নোগুচির প্রতি তাঁর আবেদন—আর পাঁচজনের সঙ্গে সংশয়াচ্ছন্ন সুকান্তকেও মানবতার প্রতি আস্থাশীল করেছিল। তাই এত হতাশার মধ্যেও দু-একটি কবিতায় তিনি আশার সুর লাগাতে পেরেছিলেন। সমসাময়িক কবিতাগুলির মধ্যে এই নতুন বিশ্বাস যে তাঁর কবিতাটিতে সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয়েছিল, সেটি হল 'জাগবার দিন আজ'। এ কবিতাটিতে পরবর্তী দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের গভীরতা লক্ষ্য করা না গেলেও একটা মানবিক কর্তব্যের আহ্বান শোনা যায় :

পণ কর দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত মিলবো সবাই এক সঙ্গে ;
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাবো আমার দেশ যাবে না তা শত্রুর দখলে,
তাই আজ ফেলে দিয়ে শিল্পীর তুলি আর লেখনী
একতাবদ্ধ হও এখনি ॥

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের সামরিক অগ্রগতি সুকান্তকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ফলে তাঁর বিশ্বাসও শিথিল হয়ে পড়ছিল বারংবার। নভেম্বর ১৯৪১-এ অরুণাচলকে লেখা নিচের চিঠিটা একাধারে তাঁর মানসিক অবস্থা এবং তার সঙ্গে কলকাতার প্রতি তাঁর ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করছে :

'আমার ওপর তোমার রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর আমি তোমার রাগকে সমর্থন করি। কারণ আমার প্রতিবাদ করবার কোনও উপায় নেই ; বিশেষত তোমার স্বপক্ষে আছে যখন বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ। কিন্তু চিঠি না লেখার মতো বিশ্বাসঘাতকতা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না যদি না আমি বাস করতাম এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে। তবুও তোমাকে আমি রাগ করতে অনুরোধ করছি। কলকাতার বাইরে একজন রাগ করবার মতো লোক থাকাও এখন আমার পক্ষে সান্ত্বনা। যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কিছুই ঘটেনি, তবুও কলকাতার নাড়ি ছেড়ে যাবার সবকটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো প্রত্যক্ষ করছি। ...ম্লানায়মান কলকাতার

...স্পন্দন ধ্বনি শুধু আগমনী ঘোষণা করছে আর আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা; তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কিনা, জানি না ডাক বিভাগ ততদিন সচল থাকবে কিনা। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে. কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন,—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ। আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসর ঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামিপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জা গ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার আজন্ম পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম এক রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণনিবিড় বুকের সান্নিধ্যে, তার স্পর্শে আমি জেগেছি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না—আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এই পৃথিবীতে থাকবো না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে আমি

কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি। সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গে আমিও নিশ্চিহ্ন হব। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে প্রতিদিন। সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে; শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম। ···এই আমার আজকের সান্ত্বনা।'

চিঠির শেষে জীবন দিয়েও যে-নতুনকে সার্থক করতে চেয়েছেন সুকান্ত, সে যে একদিন আসবেই—এ বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল দৃঢ়-মূল। তাই সেই ভয়ংকর দিনগুলি থেকে পালিয়ে বাঁচতে না চেয়ে, যশোহরবাসী অরুণাচলের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলে বরং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কদিন পরে লেখা অপর একটি চিঠিতে তাঁকে জানিয়েছেন: 'আজ আমার ভায়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ—আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলুম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল রোমাঞ্চকর পরম-মুহূর্তের সন্ধানে।'

জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণেই মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন সুকান্ত। অগ্রজের ছিল ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ। সেই সূত্রে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরা নিয়মিত আসতেন বাড়িতে। এঁদেরই একজনের কাছ থেকে আলাপ-

আলোচনা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সুকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-তাণ্ডবের মূলকারণ ও প্রকৃতিকে। কয়েক জনের লাভালাভের স্বার্থে যে মারণ-যজ্ঞ তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল সুগভীর। তারপর এই যুদ্ধে পৃথিবীর একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে নিজের সঠিক ভূমিকাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

সুকান্তর পক্ষে তবু হঠাৎ-ই সম্ভব হয়নি এই নতুন বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। দ্বিধা ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল, আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ মনে প্রশ্ন জেগেছিল :

বিজিগীষা ?—সন্দিহান আগামী দিনেরা
দৃষ্টিপথ অন্ধকার,—(লাল-সূর্য মুক্তির প্রতীক ?
আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর।)

এ মানসিক অন্বেষণকে তীব্রতর করে তুলতে আরও সাহায্য করেছিল আধুনিক বাংলা কবিতা। ইতিমধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনটি হাতে এসেছিল সুকান্তর। এটি তিনি পুংখানুপুংখ ভাবে পড়েছিলেন। উপরন্তু পাঠ নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতার বই থেকে। এঁদের কবিতায় মধ্যবিত্ত মানুষের গ্লানি ও অক্ষমতার প্রতি যে নিষ্ঠুর কশাঘাত বর্ষিত হয়েছিল এবং নতুন এক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেবার যে চেষ্টা চলছিল তা অতি ঘনিষ্ঠভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। বিশেষ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যেন সুকান্ত দেখেছিলেন নিজের মনেরই ব্যক্তরূপ। সে দিন 'পদাতিকে'র কবির বিশ্বাসের

সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে যুক্ত করে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। কেননা তখন যে 'লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা।'

এমনি ভাবে, সেই অবক্ষয়ের দিনে, সহজাত সৈনিক মনোভাব বিশ্বাসের পশ্চাদ্ভূমি লাভ করলে, রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ালেন সুকান্ত। ক্রমে সেই দম-বন্ধ-করা পরিবেশেও খুঁজে পেলেন জীবনের স্বাভাবিক স্বাদ। তাঁর এই মানসিক পরিবর্তন পরিস্ফুট হয়েছে এক বছর পরে অরুণাচলকে লেখা অপর একটি চিঠিতে :

'দৈবক্রমে এখনো বেঁচে আছি ; তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি—অপ্রত্যাশিত বোমার মতোই তোর অভিমানের সুরক্ষিত দুর্গ চূর্ণ করতে। বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়। তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য ভেদ ক'রে কৃতিত্ব দেখাবো তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহুপূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে! যাক এ সম্পর্কে নতুন ক'রে বিলাপ করবো না, যেহেতু গত বছর এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল : ইচ্ছা হ'লে পুরনো চিঠির তোরা খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময় বিপদের আশঙ্কা ছিল, বিপদ ছিল না, আর এখন তো বর্তমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এ একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। তোরা এখানকার সঠিক সংবাদ পেয়েছিস কিনা জানি না। তাই আক্রমণের একটা ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি : প্রথম

দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতিবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে (এই দিনের আক্রমণ সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ডালহাউসী অঞ্চলে (এই দিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে, আর নাগরিকদের সব চেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পর দিন কলকাতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়), আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়, কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনো অজ্ঞাত। প্রথম, তৃতীয় আর পঞ্চম দিন বালিগঞ্জে মামার বাড়িতে মামার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটেছে। চতুর্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সব চেয়ে ভয়ানক ভাবে।

সে দিনকার ছোট বর্ণনা দিই, কেমন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অধিকমাত্রায় খুশি ছিল, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ···বৌদির কাছে, কারণ কয়েক দিন আগে দাদার নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে নিজের পৌরুষের ওপর ধিক্কার এসেছিল; তাই ঠিক করলাম, না: আজ বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রে ফিরবোই···। অবিশ্যি এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনকার কর্মহীনতা, যেহেতু পরীক্ষা হয়ে গেছে, রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব অল্পই ছিল, সুতরাং মহানুভব (?) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ির দিকে রওনা হলেন।···দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না। কিছুক্ষণ গল্প করার পর ৯-১০ এমন সময় সেদিনকার সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধ হয় সাইরেন বাজছে। রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুড়ো ক'রে

সবাইকে নিচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটো-ছুটি হৈ-চৈ করে বাড়ি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু স্তব্ধ, শুরু হয়ে গেল দাদার হায় হায়, বৌদির থেকে থেকে ভাঙা আর্তনাদ, আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বলমুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে বিঁধে যেতে থাকলো, আর অবিশ্রাম এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জণ, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতেছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্বন্ধে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। ভীষণ বেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহমনে চমকে উঠি, এমনি ক'রে প্রাণপণে প্রাণকে সামলিয়ে তিন ঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল এই বিপদময়তার যেন শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণে তেমন কিছু হয়নি, যার জন্যে এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।…

…একখানা চিঠি খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তো পাঠাস, নতুবা দেরি হলে পাঠাসনি, কারণ বোমারু বিমান সর্বদাই পৃথিবীর নশ্বরতা ঘোষণা করছে।'

[ডিসেম্বর ১৯৪২]

যুদ্ধ যে সুকান্তর মনকে কতখানি গ্রাস করেছিল, এ চিঠি তার প্রমাণ। চিঠি দুটি এবং ক[illegible]ত্রর উদ্ধৃতি থেকে আরও পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত জ[illegible] পরিবেশ থেকে বেরিয়ে

এসে বাইরের জীবনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যবর্তী কালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই অন্তর্লোকের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের সংকটকালে কী দ্রুত গতিতেই না সুকান্ত নিজের মনের সঙ্গে সকল বোঝাপড়া শেষ ক'রে, নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধের যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। এই সময় তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশের মানুষকে :

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝেনিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।

রাজনীতির কাজে সুকান্তর হাতেখড়ি হয়েছিল ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে। বেশ কিছুদিন তর্কাতর্কির পর, বোঝাপড়া শেষ হলে একদিন 'অমুক-দা' তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'একটা পোস্টার লাগিয়ে আসতে পার ?' 'এখনই দিন', এই ছিল উদ্দীপ্ত সুকান্তর উত্তর। সে দিন সেই দাদা নিরস্ত করলেও রাজনীতির তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে দেরি হয়নি সুকান্তর।

স্কুলের ছাত্র হিসাবে প্রথমে তখনকার ছাত্র-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল সুকান্তকে। পর পর বিভিন্ন ছাত্র-ধর্মঘটে সংগঠকের ভূমিকা নেওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দেশবন্ধু হাই স্কুলের কর্মকর্তাদের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু কাজ কেবলমাত্র ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যেই সীমিত ছিল না। তখন বেলেঘাটায় কমিউনিস্ট কর্মীরা সংখ্যায় ছিলেন কয়েক জন, আর সে তুলনায় তাঁদের কাজ ছিল অনেক বেশি। তাই প্রত্যেক কর্মীকেই পরিশ্রম করতে হতো যথেষ্ট। সুকান্তও তাঁর অপরিণত মনের আবেগে একাই একাধিক মানুষের কাজ করতেন দিনে রাতে। সুকান্তদের বাড়ির অদূরেই একটা পোড়ো বাড়িতে ছিল কমিউনিস্টদের আস্তানা—'জনরক্ষা সমিতি'র অফিস। অফিসের দেয়াল জুড়ে পোস্টার আর পোস্টার। এই সব পোস্টারে তুলে ধরা হতো সমসাময়িক মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণার যুক্তি ও তাৎপর্য—সোভিয়েট রাশিয়ার পিছনে দেশের শ্রমিক ও

জনসাধারণকে জড়ো করার তুরন্ত প্রয়াস। সেই পোড়ো বাড়ির মাঠেই তখন জমা হতেন স্থানীয় কর্মীরা, আলাপ-আলোচনা চলতো, তারপর সবাই ছড়িয়ে পড়তেন যে যার কাজে। নিয়মিত ভাবে পাড়ায় পাড়ায় 'এ-আর-পি'র তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা বে-সরকারী সংগঠনগুলির কোন একটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিরক্ষা-মূলক কাজে উৎসাহিত করতে হতো স্থানীয় অধিবাসীদের; বেচতে হতো রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। তা ছাড়াও সারা তুপুর পোস্টার লিখে রাত্রে সেই পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে মেরে দিতে ঘুরতে হতো ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে।

ফিরতে এক এক দিন এমনই রাত হয়ে যেত যে বাবাকে জাগিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকতে পারতেন না সুকান্ত। পূর্ব-বঙ্গের আটচালার অনুরূপ ভাবে গঠিত হয়েছিল হরমোহন ঘোষ লেনের এই বাড়িটা। দোতালার একটা নির্দিষ্ট গরাদ ছিল আল্গা, সুকান্ত তা জানতেন, আর সেই পথেই যাওয়া-আসা করতেন সবার অগোচরে। এক দিন কিন্তু তাঁকে এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সদ্য দেশ থেকে আসা সুকান্তর এক জ্ঞাতি-সম্পর্কের দাদা সে দিন শুয়ে ছিলেন দোতালায়। অন্ধকারে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো একটা ছায়াশরীর জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। স্বাস্থ্যবান দাদাটি তৎক্ষণাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তুই বলিষ্ঠ বাহুতে জড়িয়ে ধরেছেন তাকে, আর আর্তকণ্ঠে চিৎকার শুরু করেছেন—'চোর···চোর ধরছি···চোর'। এর পর আলোয় সকলের সামনে যখন আবিষ্কৃত হলেন সুকান্ত, তখন তাঁর স্বভাব-লাজুক মনের কী ছায়া পড়েছিল মুখে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

অনিয়ম আর পড়াশোনার প্রতি অবহেলার ফলে বাড়ির অভিবাবকরা ক্ষুব্ধ হতেন বারবার। আরও, যখন সুকান্তর বাবা তাঁর রক্ষণশীল বন্ধুদের কাছ থেকে জানতেন ছেলেটি তাঁর কমিউনিস্ট নাস্তিকদের পাল্লায় পড়েছে—অর্থাৎ গোল্লায় গেছে—তখন তাঁর দুঃখের আর অন্ত থাকতো না। সুকান্তর প্রতি মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তাঁর নির্লিপ্ত মন কঠিন হতে পারতো না—বিশেষ করে ছেলেটি যখন মা-মরা। তবু বাড়ির বড়দের চোখের আড়ালে আড়ালে চলার একটা অভ্যাস সুকান্তর জন্মে গেল তখন থেকেই। বাড়ির মাইনে করা রাঁধুনি রান্না শেষ করে, যারা দেরিতে খেত তাঁদের জন্যে খাবার ঢেকে রেখে, চলে যেত বলে এমনি এড়িয়ে চলাটা ছিল আরও সহজ। তাই সুকান্তর তখন থেকেই নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম শুরু হয়ে গেল। আর এই দিনরাত পরিশ্রমের বিনিময়ে সুকান্ত অর্জন করলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ—যতদূর জানা যায় সেই সময় তিনিই ছিলেন এর তরুণতম সভ্য।

দৈনন্দিন কাজের চাপে স্কুলের পড়াশোনায় অবহেলা ঘটলেও লেখা চলছিল পুরোদমে। শুধু রচনার বিষয় ও ভাব যাচ্ছিল বদলে। এ সময় রাজনীতিতে সুকান্তর যে গভীর ঝোঁক তা তাঁর কিছু লেখায় অত্যন্ত প্রকট। কোন এক সহকর্মীর কথায় লেখা তখনকার একটি রচনা 'জনযুদ্ধের গান'। গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত 'এক সূত্রে' সংকলনটিতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ লেখা সুকান্তর উদাহরণ হবার অনুপযুক্ত হলেও, তাঁর কবিতার বিবর্তনের দিক থেকে লক্ষণীয়:

জনগন-শক্তির ভয় নেই
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।
নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন ভগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।
কর জাপানের আজ গতি রুদ্ধ
শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতাও উল্লেখ্য। এটিও কাব্য হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। স্বৈরাচারী জাপান এবং তার ভারতীয় ভক্তদের প্রতি মূর্ত ঘৃণা আর সেই সঙ্গে বাচনভঙ্গির ঋজুতা ও তীব্র শ্লেষ এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য। কবিতাটি যেন লিখছে কোন বন্ধুর প্রতি জনৈক স্বদেশদ্রোহী বিভীষণ :

ভাল কথা, আমি প্রতিদিন
টোকিও, বার্লিন
শুনি—
আর জাপানের পদধ্বনি গুনি ;···
আমাদের যখন দরকার
জাপান সরকার
ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক,
কিন্তু ক-টা অবাধ্য চৈনিক
অন্তরায়
আমাদের স্বরাজ পাওয়ায়।
আর অন্তরায় শুধু সাম্যবাদী দল
স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানির ছল !

—এই কথা রাষ্ট্র করে তারা—
ব্রিটিশের গৌরীসেনী অর্থে পুষ্ট যারা।

সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী সুকান্তর আন্তর্জাতিক চেতনার অভিব্যক্তি এই কবিতাটি। এতে সুকান্তর ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রতি যাঁরা একদা মনে করেছিলেন জাপানী ফ্যাসিস্টরা ভারতে আসছে কেবল ভারতবাসীকে ইংরেজদের অধীন থেকে মুক্ত করে দিতে—যাঁরা জাপানের তখনকার মানবতা বিরোধী ফ্যাসিস্ট চেহারাটা চিনে উঠতে পারেন নি!

সুকান্তর এক জেঠাতুত দাদা মনোজ ভট্টাচার্য ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার নিয়মিত পাঠক। এঁর কাছ থেকেই বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা ও বিভিন্ন আধুনিক কবির কবিতার বই পড়ার সুযোগ ঘটেছিল সুকান্তর। মনোজই তাঁর স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকান্তর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। একটি খাতায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা সুকান্তর কিছু কবিতা পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন সুভাষ—এত অল্প বয়সী ছেলে এমন পরিণত ও বলিষ্ঠ কবিতা লিখলো কী করে! সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় সুকান্তর জীবনে একটা বড় ঘটনা। কেননা সুভাষকেই তিনি তাঁর কবিচেতনার গুরু বলে মানতেন।

ইতিমধ্যে সুকান্তর কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে 'অরণি', 'পরিচয়', 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়। তাঁর প্রকাশিত কবিতা যাঁর চোখে পড়েছে তিনিই বুঝেছিলেন সুকান্ত

এক জন্মগত অধিকার নিয়ে হাজির হয়েছেন বাংলা দেশের কাব্যলোকে। তখনকার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও 'শিল্পী সংঘের সদস্য হবার পর তাই বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হতে দেরি হয় নি সুকান্তর। প্রত্যেকের কাছেই কিশোর সুকান্ত ছিলেন বিস্ময়, তাঁর কবিতা উদ্দীপনার কারণ।

এর কিছু দিন পরেই সুকান্ত তাঁর মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যদের লেকের এক সাহিত্য সভায় বুদ্ধদেব বসুর উপস্থিতিতে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি প'ড়েছিলেন। সাহিত্য সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি'র সভ্যদের উদ্যোগে। সুকান্তর জেঠাতুত দাদাদের দু-এক জন এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের একটি দল এই সংগঠনটি নিয়ে মেতেছিলেন কিছু দিন। কিন্তু লেক মিলিটারির কবলে গেলে সোসাইটিটির বিপর্যয় ঘটেছিল আর তাঁদের মন ভেঙ্গে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনায়। এ সময় এঁদেরই একজনকে একটি কবিতা লিখে শোকজ্ঞাপন করেছিলেন সুকান্ত। কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' কবিতার প্যারডি বিশেষ, 'ভারতীয় জীবনত্রাণ সমাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস' :

…ক্লাব উঠে গিয়েছে সফরে
শূন্য ঘর, শূন্য মাঠ,
ফুল ফোটা মালঞ্চ প'ড়ে :
ত্যক্ত এ ক্লাবের কক্ষে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে।
সূর্য অস্ত গিয়েছে কখন,
কারো আজ দেখা নেই—
কোথাও বন্ধুর দল ছড়ায় না হাসি,

নিষ্প্রভ ভোজের স্বপ্ন :
একটি কথাও শব্দ তোলে না বাতাসে—
ক্লাব ঘরে ধুলো জমে,
বিনা গল্পে সন্ধ্যা হয় ;
চাঁদ ওঠে উন্মুক্ত আকাশে।
খেলোয়াড় খেলে নাকো,
গায়কেরা গায় নাকো গান—
বক্তারা বলে না কথা,
সাঁতারুর বন্ধ আজ স্নান।
সর্বস্ব নিয়েছে গোরা তারা মারে উরুতে চাপড়,
যে পথে এ ক্লাব গেছে কে জানে সে পথের খবর ?
সন্ধ্যার আভাস আসে ;
জ্বলেনা আলোক ক্লাব কক্ষের কোলে,
হাতে হাতে নেই সিগারেট—
তর্কাতর্কি হয় নাকো বিভক্ত দু দলে ;
অযথা সন্ধ্যায় কোন অচেনার পদশব্দে
মালীটা হাঁকে না।

যুগসন্ধিকালের কবি সুকান্ত। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার আগেই 'যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়' একের পর এক এসে তাঁর মনকে মথিত ক'রে গেছে। ঘটনার দ্রুততায় আর ঘাতপ্রতিঘাতে অনভিজ্ঞ সুকান্তর পক্ষে দিশাহারা হয়ে পড়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর সৌভাগ্য, তিনি সেই অতীব দুর্দিনেও বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি পেয়েছিলেন। লেখকের জীবনে যে কোন একটি বিশ্বাসই দুর্লভ কিন্তু অপরিহার্য। সমসাময়িক যুগের সঙ্গে তাল রেখে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে সাম্যবাদ যে-ভরসা জুগিয়েছিল তার মূল্য সুকান্তর কবি জীবনে তাই অপরিসীম।

এত দিনে জাপানী বোমা নিয়মিত চিহ্নিত করছে ভারতবর্ষের বুক। চট্টগ্রামের ওপর চলছে প্রচণ্ড আক্রমণ। এ দেশের স্বাদেশিকতায় দীপ্যমান সুকান্তর পক্ষে এই আক্রমণকে স্বীকৃতি দান করা ছিল অসম্ভব। সূর্য সেনের কর্মভূমি, বহু শহীদের রক্তে রাঙা বিদ্রোহী চট্টগ্রামকে স্মরণ ক'রে তাই লিখলেন :

> চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম
> এখনও নিঃস্তব্ধ তুমি
> তাই আজও পাশবিকতার
> দুঃসহ মহড়া চলে
> তাই আজও শত্রুরা সাহসী।

এর পর জাপানীরা আরও এগিয়ে এলে, আসামের মাটিতে করলে

পদার্পন, সুকান্তর কণ্ঠস্বরও উদাত্ততর হল 'মণিপুর' কবিতায়। দেশের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রতি ভালবাসায় নিবিড় এই অসামান্য কবিতাটিতে জন্মভূমির বুকে শত্রুর দাম্ভিক পদশব্দে বেদনার্ত সুকান্ত আহ্বান জানালেন দেশবাসীকে :

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার
পদচিহ্ন রাখে
এখনও শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে?

ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এমনি কিছু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হতে পারেন নি সুকান্ত। অভিনয় ক'রে গ্রামে ও শহরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে একাধিক প্রচারমূলক নাটিকা লিখে দিয়েছিলেন তিনি গণনাট্য সংঘকে। প্রাত্যহিক কাজ হিসাবে 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করেছেন নিয়মিত। আর কিছু দিন যখন নারকেলডাঙার জুটমিল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, তখন ফ্যাসিস্ট বিরোধী পোস্টারও লিখেছেন বহু। কবিতা ও কাজের মধ্যে একাত্মতার স্বাক্ষর রাখতেই যেন জুটমিলের বেগুনে কালি দিয়ে পোস্টারের পিছনে কবিতা লিখে রেখে গেছেন সুকান্ত—যেমন 'শত্রু এক' ও 'উদ্বীক্ষণ'। সেই দুর্দিনেও এ সব কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে গভীর প্রত্যয়।

গত মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে এ দেশে সাম্যবাদীদের কাজ করার পথ কিন্তু নিরঙ্কুশ ছিল না মোটেই। তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিসন্ধিমূলক প্রচার চালানো হতো সুপরিকল্পিত ভাবে। শুধু তাই নয়, সে প্রচারের অভিব্যক্তি ঘটতো যে সব ঘটনায়

তাও ছিল মর্মান্তিক—যেমন ঢাকার রাজপথে সোমেন চন্দের হত্যা। এ ধরণের ঘটনা গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিত কর্মী সুকান্তর মনে। ঘৃণায় আর ক্ষোভে জ্বলে উঠতেন তিনি। তাঁর এই অন্তর্জ্বালা থেকেই রচিত হয়েছিল 'অরণি'তে প্রকাশিত 'ছুরি' কবিতাটি।

সুকান্তর জীবনে যুদ্ধের চেয়েও প্রত্যক্ষ আর মর্মন্তুদ হয়ে দেখা দিয়েছিল তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর। কর্মী হিসাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে। বেলেঘাটার 'জনরক্ষা সমিতি'র পক্ষ থেকে আরও কয়েক জনের সঙ্গে সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁদের কাজ ছিল কখনো নিরন্নদের অন্ন বিতরণ, আবার কখনো বা শৃঙ্খলায় অনভ্যস্থ জনতাকে লাইন দিয়ে চাল, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি অতি-প্রয়োজনীয় জিনিস কেনায় সাহায্য করা। সেই সব দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলোর স্মৃতি হয়তো আজও অনেক নাগরিকের মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায় নি। তাঁরা হয়তো আজও স্মরণ করতে পারেন জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর জন্যে হন্যে হওয়া দিনগুলোকে। আর সেই সঙ্গে সেই সব স্বেচ্ছাসেবকদের কথাও, যারা আপ্রাণ খেটে গেছে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সংযত ক'রে সুষ্ঠু ও দ্রুত বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে। এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সব থেকে সৎ ও একনিষ্ঠ ছিল যে অংশ, তাদেরই অন্যতম ছিলেন সুকান্ত। কী কঠিন পরিশ্রম করতেন প্রত্যহ—কোন্ সকালে বেরিয়ে সূর্য পশ্চিমে বেশ

কিছুটা হেলে পড়লে ক্লান্ত দেহ টেনে বাড়ি ফিরতেন তিনি। অথচ এর জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাপ্য একটা চালের টিকিট সঙ্গে নিয়ে ফেরেন নি কোন দিন। প্রয়োজন ছিল না এমন নয়। বরং পরিবারের দরকারে ঐ মহামূল্য বস্তুটি সংগ্রহ করতে প্রায় প্রাণপাত হতো তাঁরই ছোট ভায়েদের। তবু এই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণেই স্বেচ্ছাসেবক, সেবার কোন বিনিময় গ্রহণ তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব।

পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে মানবতার অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখলেন সুকান্ত। বাংলা দেশের চাষী-জনগণের যে অপমান সংগঠিত হল কলকাতার উন্মুক্ত রাজপথে, তার সবটুকু বেদনাই যেন তাঁর সদ্যস্ফুট অন্তরকে দীর্ণ করে দিল। তাই সে-দিন চিরাচরিত অলংকারের নীতিশীলতা বর্জন ক'রেও ছন্দে তিনি যে 'বিবৃতি' লিখলেন তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতো অরাজনৈতিক সমালোচকের কাছ থেকেও 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্পন্দসুন্দর' কাব্য বলে অভিনন্দন পেয়েছে।

গত মন্বন্তর বাংলার প্রায় প্রত্যেক আধুনিক কবির মনেই গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। সেই সব কবিদের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতার একটি প্রতিনিধিমূলক সংকলন প্রকাশের আয়োজন করে তখনকার সমাজচেতন সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সংগঠন, 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। যদিও সুকান্ত ছিলেন এই সংগঠনের তরুণতম সদস্য, তবু তাঁর সমসাময়িক কবিতার সার্থকতার জন্যেই যেন সংকলনটি সম্পাদনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'আকাল' নামে প্রকাশিত এই সংকলনটিতে সুকান্তর লেখা ভূমিকাটি পড়লে পাওয়া যায় তাঁর সজীব ও

স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচয়। প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি: 'বাংলা দেশের কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহার, পীড়া পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবল ভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গতজনের মুখপাত্র? তাঁদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি?'

এ সব প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাওয়া গিয়েছিল 'আকাল'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন কবির কবিতায়। কিন্তু চূড়ান্ত জবাব একক ভাবে যদি কেউ দিয়ে থাকেন তবে তিনি স্বয়ং সুকান্ত। গত দুর্ভিক্ষ যে কী প্রবল ভাবে তাঁকে নাড়া দিয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর 'বিবৃতি', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'বোধন', 'ফসলের ডাক', 'এই নবান্ন' ইত্যাদি কবিতা পড়লে। অনেকের মতে 'বোধন' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সুতরাং এই কবিতাটির পটভূমি হিসাবেও সুকান্তর জীবনে পঞ্চাশ সালের গুরুত্ব অনুমেয়। 'বোধন' সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন: '৯৫ পংক্তিতে রচিত এই কবিতাটিকে আমি এযুগের মহাকাব্য বলতে চাই। অন্তত ১৩৫০ থেকে ১৩৫৪-র মধ্যে এমন শক্তিশালী অথচ রসোত্তীর্ণ কবিতা যে আমার চোখে পড়েনি সে কথা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে। ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ পরিবর্তনের ফলেও এর মধ্যে মহাকাব্যোচিত মহিমা এসেছে। …এর পেছনে শুধু অশুভ তাণ্ডবই নেই, আছে শিবপ্রতিষ্ঠার শুভেচ্ছা। সেজন্যেই বোধন এযুগের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। এযুগে জনজীবন চেতনা নিয়ে কাব্যসাহিত্যে অনেক সৃষ্টি পরীক্ষাই

হয়েছে, কিন্তু শত শত পরীক্ষার পর যদি এমন একটি সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হয় তবে সে পরীক্ষার মূল্য অপরিসীম।'

গাঁ-ছাড়া নিরন্ন কৃষকদের বুভুক্ষু এক মিছিল এসে সুকান্তর অন্তস্থলে হঠাৎ ঝড় তুলে আবার যে তা বছরান্তে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছিল, আর তিনিও ক্রমে তাদের উপস্থিতি ভুলে অন্যকর্মে নিযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এমন নয়। এর কারণ, কর্মী হিসাবে সুকান্ত ছিলেন সেই সব দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অতি-ঘনিষ্ঠজন। তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভ আর অপমানকে নিজের বলে অনুভব ক'রে, তাঁদের সমস্যাবলীর সমাধানের পথ অনুসন্ধানে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। ফলে দুর্ভিক্ষ পরবর্তী কালের সমস্যাও স্থানলাভ করলো তাঁর কবিতায়।

যে সুকান্ত ১৩৫০ সালের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে স্বজনবিয়োগে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করেছেন :

> শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার
> তোদের প্রাসাদে জমা হ'ল কত মৃত মানুষের হাড়
> হিসাব দিবি কি তার ?
> প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
> ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
> সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
> কখনো ভুলতে পারি ?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবোই।

১৩৫১ সালে শহরবাসী কৃষকদের সঙ্গে তিনিই আবার ভাবতে শুরু করেছেন পিছনে ফেলে আসা ধানক্ষেতের কথা। দেশে তখন ফসল ফলেছে অঢেল, অথচ সে ফসল ঘরে তোলার মানুষ নেই গ্রামে—এতো দিনে কেউ তারা মরেছে অনাহারে, কেউ বা হয়েছে দেশান্তরী। কবির মুখে এখন তাই ধ্বনিত হল নতুন ভাষা। নতুন করে জীবনকে গড়ে তোলার আশায় তিনি যেন কৃষকশ্রেণীর প্রতিভূ হয়ে দু বাহু মেলে আহ্বান জানাচ্ছেন 'ফসলের ডাকে' :

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে ঝাঁপ দেব তাতে।
আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

মৃত্যু আর মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় কবি বুঝেছিলেন চিরাচরিত পদ্ধতিতে কোনক্রমে জীবনরক্ষার জন্যে বেঁচে থাকায় নেই নিরাপত্তার আশ্বাস। সেই কারণে মানুষের স্বাধীন সত্তাকে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত করতে নতুন কৃষকসমাজের আগমনী গাইলেন তিনি, পশ্চাৎবর্তীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন অগ্রগামীদের বীজমন্ত্র। মরচে পড়া পুরনো কাস্তের বদলে প্রতীক হল নতুন এক কাস্তে—যে কাস্তে চৈতন্য প্রখর, 'যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে'।

শহরের মৃত্যুকীর্ণ পথে পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সুকান্ত অনুভব করেছিলেন নতুন যুগের সূচনা। মনের চোখে তাই অঙ্কুরিত হল এক নতুন ফসল—সে ফসল আর কিছু নয়, রাজনৈতিক চেতনায় জাগরূক দেশবাসী। কবি জানতেন সেই আসন্ন নতুন ফসলই ছিন্ন করবে সমস্ত বিধি-বাঁধন। গভীর বিশ্বাসে তিনি গেয়েছিলেন সচেতন 'কৃষকের গান' :

এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি ?
(গোপনে একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেবো আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।

ভবিষ্যতের প্রতি কবি-মনের এই স্বপ্নই সুকান্তকে ঠেলে দিয়েছিল 'কিশোর বাহিনী' নামে এককালীন বাংলা দেশ জোড়া কিশোর সংগঠনটিকে গড়ে তোলার কাজে। পঞ্চাশ সালের অসুস্থ পরিবেশ কিশোরদের মনে যে দূষিত প্রভাব বিস্তার করছিল, তার কবল থেকে তাদের কোমল সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্রত হল এই বাহিনীর। সংগঠক হিসাবে অসাধারণ নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সুকান্ত। অল্প দিনের মধ্যেই

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলা দেশে ও তার বাইরে ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় তিনশ' 'কিশোর বাহিনী'তে প্রায় তিরিশ হাজার ছেলেমেয়েকে সংগঠিত করেছিলেন সুকান্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা ও স্বাধীনতার আদর্শে এদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি। তাঁর ঐকান্তিকতা ও সাফল্য যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিকদেরও ছোটদের এই বিরাট সাংস্কৃতিক সংগঠনটির পিছনে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

কিশোরদের ঘনিষ্ঠ হয়ে সুকান্ত বুঝেছিলেন, নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরণের কিশোর সাহিত্য রচিত হওয়া প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষ যখন তাদের চালের লাইনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সাইরেন যখন তাদের জীবনে বয়ে আনছে দূরাগত বিপদের ভয়াবহতা, তখন সেই সমস্যা জর্জরিত কিশোরেরা যে আর আজগুবি গল্পে পরিতৃপ্ত হবে না, পাবে না পরিণত হয়ে ওঠবার উপযুক্ত খোরাক—এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে না গিয়ে কিশোরদের কল্পনাপ্রবণ মনকে সুপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা'র বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুকান্ত। আর এই 'কিশোর সভা'য় প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও আদর্শমূলক কাহিনী রচনার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি সাহিত্যিকদের প্রতি। নিজেও তিনি কলম ধরেছিলেন ছোটদের জন্যে। 'মিঠেকড়া'র ছড়াগুলি পড়লে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

'কিশোর বাহিনী'র ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের জন্য লেখা

রূপক কাব্যনাট্য 'অভিযানে' মূর্ত হয়েছে আদর্শ কিশোর সাহিত্য সম্পর্কে সুকান্তর মনোভাব। 'অভিযানে'র নায়িকা সংকলিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে ছোটদের অন্তরস্থ সেবার মূর্তিটি। সংকলিতা তার দেশের দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষের জন্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে হাজির হল পাশের একটি দেশে। সেখানে সে গান গেয়ে জড়ো করলো অন্য সব কিশোর ভাইদের। সবাই ছুটে এল সাহায্য করতে। কিন্তু বাধা আসলো সে দেশের রাজা ও তার সাঁকরেদদের কাছ থেকে। ঘটনান্তরে অত্যাচারী কোতোয়ালের হাতে প্রাণ দিল সংকলিতা. আর তারই ফলে জেগে উঠলো জনগণ। এই হল নাটিকাটির কাহিনা। সংকলিতার মর্মস্পর্শী আবেদনটিতে যেন শোনা যায় সুকান্তরই কণ্ঠস্বর, পাওয়া যায় দেশের মানুষের দুর্গতিতে আকুল তাঁর অকৃত্রিম হৃদয়ের স্পর্শ :

আমার দেশেতে আজ মরে লোক অনাহারে
এসেছি তাদের তরে মহামানবের দ্বারে।
লাখে লাখে তারা আজ পথের দুধার থেকে
মৃত্যু দলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে।
চাষী ভুলে গেছে চাষ মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ।
উজাড় নগরগ্রাম, কোথাও জ্বলেনা বাতি,
হাজার শিশুরা মরে দেশের আগামী জাতি।
রোগের প্রাসাদ ওঠে সেখানে প্রতিটি ঘরে,
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালে উদর ভরে।
এখনো রয়েছে কোটি মরণের পথ চেয়ে
তাইতো ভিক্ষা মাগি এ দেশে এ গান গেয়ে॥

হরমোহন ঘোষ লেন ছেড়ে ১৯৪২-এর শেষ দিকে নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের ২০ নম্বর বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছিলেন সুকান্তরা। এ বাড়িতে সচরাচর যে ঘরে বসে লিখতেন সুকান্ত সেটি ছিল ঠিক রাস্তার ধারেই। রাস্তায় বয়ে যেত জীবনের বিচিত্র কোলাহল আর নিরবচ্ছিন্ন যানবাহন। জানালা দিয়ে উত্তরে তাকালে চোখে পড়তো সরীসৃপের মতো শুয়ে থাকা মালগাড়ির দীর্ঘ লাইন। সূর্যক্ষরা দুপুরে দিগন্তে বাঁক নিয়ে হারিয়ে যাওয়া সারি সারি রেলগুলো যেন ঝলসে উঠতো—দূরে নেচে চলতো মরীচিকার মতো হিলহিলে বাষ্পীয় শিখা। আকাশে কখনো শঙ্খ চিল চিৎকারে গলা ফাটাতো, কখনো বা একটা ঘুড়ি এসে লটকে যেত অসংখ্য নারকেল গাছগুলির কোন একটির মাথায়। চারিদিকে ছড়ানো শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদি বই-এর ফর্মার স্তূপের এক ধারে, একটা পুরনো টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে, এই ঘরের এই পরিবেশে অনেক কবিতাই লিখেছেন সুকান্ত।

সুকান্তর অগ্রজ সুশীল ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৪-এর জুন মাসের কোন এক দিন। নববধূকে অভ্যর্থনা করতে ব্লাক-আউটের একটি রাত্রি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল ছন্নছাড়া পরিবারটিতে। দীর্ঘ দিন ধরে কল্যাণময় যে স্পর্শের অভাব অনুভূত হয়েছিল তাঁর মনে, তারই যেন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় নতুন বৌদির উদ্দেশ্যে লেখা একটি কবিতায়। কবিতাটি

শেষ পর্যন্ত বৌদিকে দিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ লজ্জায়। কবিতাটির নিচের উদ্ধৃতিটুকু থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাঁদের পরিবারের তখনকার চেহারাটা :

এ শহর নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রদীপ আমাদের ঘর,
জমেছে উদাস ধূলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া
তাইতো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।

শেষ পংক্তিটিতে নববধূর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন সুকান্ত : 'একটি প্রদীপ এনো, এখানে কখনো যদি আসো।' নতুন বৌদির অপটু হাতের ছোঁয়ায় বাড়ির আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুটা বদলেছিল, কিন্তু বদলায় নি সুকান্তর রাস্তামুখো মন। তাঁর তখনকার ব্যস্ততার আভাস পাওয়া যাবে অরুণাচলকে লেখা নিচের এই চিঠিটা থেকে :

'দোস্ত,

কয়েকটা কারণে আমার তোর ওখানে যাওয়া হল না। যেমন,

১। কিশোর বাহিনীর দুধের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু হল। (১৪ই জুন 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য)।

২। ১৫ই জুন এ. আই. এস. এফ.-এর কনফারেন্স।

৩। কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয় নি।

৪। ১৩ই জুন এ. আই. এস. এফ-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

৫। ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।

৬। কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতেই হবে।

৭। ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

৮। এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

তোদের ওখানকার কিশোর বাহিনীকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। নতুন আন্দোলনের জন্য……আমায় ছাড়ল না।'…

এমনি নানা কাজে সারাটা দিন শহরময় ঘুরে বেড়াতেন সুকান্ত। তাঁর ত্রিভুজ আকৃতির পরিক্রমণ পথে ছিল তিনটি মূল লক্ষ্যবিন্দু: একটি নারকেলডাঙায় তাঁর নিজের বাড়ি; দ্বিতীয়টি কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ভবানী দত্ত লেনে 'কিশোর বাহিনী'র কেন্দ্রীয় অফিস; এবং তৃতীয়টি হল শ্যামবাজারে জেঠাইমাদের বাড়ি বা বাগবাজারে বড়মাসি, অর্থাৎ ভূপেনদের বাড়ি। দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থলটি আরও দূরে সরে গিয়েছিল এক বছর পরে, যখন এসপ্লানেড অঞ্চলের ডেকার্স লেনে চালু হয়েছিল 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অফিস। গাড়ি ভাড়া বাবদ সংগঠনের কাছ থেকে কিছু নিতেন না তিনি, আর এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাসের জন্য বাবার কাছেও হাত পাততে চাইতেন না সহজে; ফলে বহু দিনই তাঁকে এই দীর্ঘ পথ পার হতে হয়েছে পদাতিক যাত্রায়। বেলেঘাটাতেও বিভিন্ন কাজে ঘুরতে হতো সুকান্তকে এবং এখানেও তাঁর ছিল তিনটি বিশ্রাম কেন্দ্র। তাঁর বাড়ি ছাড়া অপর দুটি হল বেলেঘাটা মেন রোডের দু প্রান্তে অবস্থিত অরুণাচলের ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আস্তানা। নাওয়া-খাওয়ার অনিয়মের সঙ্গে হেঁটে চলার এই পরিশ্রমই ক্রমে কাহিল করে ফেলেছিল সুকান্তকে।

এতো ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু সজীব ছিল সুকান্তর শিল্পী-মন। যেখানেই শুতেন, বসতেন বা থাকতেন—সর্বত্র একটা সৌন্দর্যের আভাস দিতে চাইতেন তিনি। শোবার খাটের ঠিক ওপরেই, একটা ভেজানো দরজার দুপাশে দুটো ছবি নিজের হাতে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এ দুটি ছিল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে আঁকানো একটি কৃষক ও একটি মজুরের ছবি। চিত্রকলার প্রতি তাঁর এই পক্ষপাতের ফলে অরুণাচলের কাছ থেকে চেয়ে মনীষী দে-র আঁকা একটি নিসর্গ চিত্র ও নন্দলালের ছবির একটি জাপানী প্রিণ্টও দেওয়ালে ঝুলিয়েছিলেন সুকান্ত। তাছাড়া লেখার টেবিলের যে ড্রয়ারে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকতো তার ঢাকনাতেও আঁটা ছিল দুটো ছোট কার্ড—একটিতে পি. সি. যোশীর ছবি, অপরটিতে স্তালিনের। ছবি দুটির নিচে লাল কালিতে লেখা ছিল যথাক্রমে সুকান্ত ও সমর সেনের দু পংক্তি করে কবিতা :

নিঃশব্দে এদেশে টানে জনমন-রথ-বন্ধ রশি
পূর্ণ চন্দ্র যোশী।

এবং

বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ স্তালিন।

কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য সভা থেকে নিমন্ত্রণ পেলেও নিজের চারপাশে সাহিত্যিক পরিবেশ রচনার প্রয়াস ছিল সুকান্তর চিরদিন। তাই পরিচিত বন্ধুবান্ধব কেউ কিছু লিখলে উৎসাহ দিতেন, প্রয়োজন বোধে লিখিয়েও নিতেন কারো কারো

কাছ থেকে। একবার অরুণাচলকে তাঁর যশোহর থেকে প্রকাশিত 'ত্রিদিব' পত্রিকার জন্যে লেখা যোগাড় করে দিতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে ছিলেন সুকান্ত। একটি চিঠিতে নিজেই লিখছেন: 'মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে, ভূপেনের একজন বৌদি আছেন অত্যন্ত ভালো মানুষ, তাঁকে এক দিন এমন চেপে ধরেছিলাম সাঁড়াশির মতো লেখা আদায়ের জন্যে যে উনি কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। কারণ প্রায় আধঘণ্টা ধরে নাছোড়-বান্দার মতো ব্যাকুল হয়ে লেখা চাইছিলাম, পরিশেষে পায়ে ধববার যখন আয়োজন করছিলাম তখন দেখি তাঁর অবস্থা শোচনীয়, কাজেই আখমাড়াই কলের মতো অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।'

অরুণাচল, ভূপেন ও ছোট মামা বিমলকে নিয়ে একটা বারোয়ারী উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন সুকান্ত। প্রত্যেক শনিবার যে বার যাঁর রচিত অংশ পাঠ হবার কথা, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন বাকি তিন জন। তারপর অতিথি সংকার সাঙ্গ হলে শোনা হতো উপন্যাসের নবতম অধ্যায়টি। কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় যে যার ইচ্ছা মতো কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে চলতেন; একজন হয়তো ফেলেই দিয়েছেন ডোবায়, অন্যজন তাকে উদ্ধার করেছেন সেখান থেকে। কিন্তু দাঙ্গার দরুণ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই নিহত হয়েছিল উপন্যাসটি।

এঁরা চারজনেই ছিলেন সাহিত্যের প্রতি উৎসাহী। তাই তাঁদের বন্ধুত্বও ছিল নিবিড়। অরুণাচলের কথা বাদ দিলেও,

সুকান্তকে দিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন ভূপেন। আর বিমলের জন্যে একটি ছোট খাতায় উনিশটা গান লিখে দিয়েছিলেন সুকান্ত। এই গানগুলি মূলত রৌদ্ররসের কবি সুকান্তর রচনায় বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়। তাই কয়েকটি গানের দু-চার পংক্তি ক'রে তুলে দেওয়া গেল :

গানের সাগর পাড়ি দিলাম সুরের তরঙ্গে,
প্রাণ ছুটেছে নিরুদ্দেশে ভাবের তুরঙ্গে।
আমার আকাশ মীড়ের মূর্ছনাতে
উধাও দিনে রাতে,
তান তুলেছে অন্তবিহীন রসের মৃদঙ্গে।

শয়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে
তন্দ্রা ছুটিল যবে,
দেখিলাম আমি খোলা বাতায়নে
তুমি আনমনা কুসুম চয়নে
অন্তর মোর ভরে গেল সৌরভে।

সাঁঝের আঁধার ঘিরলো যখন
শালপিয়ালের বন,
তারই আভাস দিল আমায়
হঠাৎ সমীরণ,

কুটির ছেড়ে বাইরে এসে দেখি
আকাশ কোণে তারার লেখালেখি
শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

... ...

কঙ্কণ-কিঙ্কিনী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি,
মম অন্তর প্রাঙ্গণে আসন্ন হল আগমনী।
ঘুমভাঙা উদ্বেল রাতে
আধফোটা ভীরু জ্যোৎস্নাতে
করি চরণের ছোঁয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি।

... ...

কিছু দিয়ে যাও এই ধূলি মাখা পান্থশালায়
কিছু মধু দাও আমার বুকের ফুলের মালায়।
কতজন গেল এ পথ দিয়ে
আমার বুকের সুবাস নিয়ে।
কিছু ধন তার দিয়ে গেল মোর সোনার থালায়।

এই গীতি-কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে যেন প্রকৃতির স্পর্শ ছড়ানো। ব্যক্তিগত জীবনেও কবি সুকান্তকে প্রকৃতি টানতো তার নিবিড় সান্নিধ্যে। তাই যখনি সুযোগ পেয়েছেন, শহরের কর্মব্যস্ততাকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন দূরে—সাঁওতাল পরগনা কিংবা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে, কাশী কিংবা চট্টগ্রামে। অতি দুর্যোগময় দুর্ভিক্ষের বছরটিতেও কিছু দিনের জন্যে মেজদা-মেজবৌদিদের সঙ্গে রাঁচি বেড়িয়ে এসেছিলেন

সুকান্ত। রাঁচির নিসর্গ তাঁর মনে কতখানি সাড়া জাগিয়েছিল তা তিনি লিখে জানিয়েছিলেন অরুণাচলকে: ···'রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে আঠারো মাইল দূরে জোন্‌হা প্রপাত দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামলো এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দু ধারে পাহাড় বন ঝাপ্‌সা ক'রে অনেক জলধারার সৃষ্টি ক'রে বৃষ্টি আমাদের রোমাঞ্চিত করলো। কিন্তু আরো আনন্দ বাকি ছিল—প্রতীক্ষা করেছিল আমাদের জন্য জোন্‌হা পাহাড়ের অভ্যন্তর। বৃষ্টি ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির রক্ষক এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। মন্দিরের সৌম্য গাম্ভীর্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলুম নিঃশব্দে, ধীর পদক্ষেপে। মন্দিরের সংলগ্ন কয়েকটি লোহার দুয়ার এবং গবাক্ষবিশিষ্ট কক্ষ ছিল, সেগুলি আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম; ফুল তুললাম, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি করলাম। সেই ধ্বনি পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছল না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল. সেই অরণ্যসংকুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশি, আমরা তাই সেই মন্দিরেই আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করলো। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর একটা সত্যকারের প্রলয় হিসাবে দেখা দিল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না লিখে পারলো না······। প্রপাত দেখবার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বুদ্ধদেবের বন্দনা করলাম। তারপর গল্প-গুজব করে, অবশেষে

নৈশ ভোজন শেষ করে, আমরা সেই স্তব্ধ নিবিড় গহন-অরণ্যময় পাহাড়ে জোন্‌হার দূরনিস্মৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ···জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগলো কঠিন পাথরের ওপর। আঘাতজর্জর জলধারার ওপর জেগে রইলো রক্তের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগলো আমাদের ক্লান্ত নিশ্বাস ; প্রহরীর মতো জেগে রইলো ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়।'······

অথচ কাশী সুকান্তর মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। অতি শৈশবে প্রথম যে বার তিনি তাঁর দাদামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে বিস্ময় ছিল সেখানকার লেজ-ঝোলা বাঁদরগুলো। আর দ্বিতীয় দফার পৌঁছলে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল কাশীর ধর্মান্ধতা। তাই সারনাথের ঐতিহাসিকতা ছাড়া আর কিছুই তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারলো না।

এতেই মনে হয় মানবিক আবেদন শূন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন। তিনি প্রকৃতিকে মানুষের ক্রীড়াভূমি বলেই জানতেন। তাই কবিসুলভ নির্জনতা প্রীতির কথা তুললে একটি চিঠিতে মেজবৌদিকে লিখেছিলেন সুকান্ত—'কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি ? আমি যে জনগণের কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে ? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজকারবার সব জনতা নিয়েই।'···

কাশীতে দ্বিতীয় দফায় ১৯৪৪-এর শেষ দিকে যে সময় গিয়েছিলেন তখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পর পর দু বার ভুগতে হয়েছিল সুকান্তকে। মেজবৌদির সেবা-যত্নে সেরে উঠে কলকাতায় ফিরে শ্যামবাজারে তাঁদের কাছেই ছিলেন কিছুদিন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসবার জন্যে তৈরী হতে হল তাঁকে—কেননা পঁয়তাল্লিশ সালটাই ছিল তাঁর পরীক্ষার নির্দিষ্ট বছর।

অঙ্কে ফেল ক'রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন সুকান্ত। পরের বছর আবার পরীক্ষা দেবার জন্যে নারকেল-ডাঙার বাড়িতে একজন অঙ্কের মাস্টার নিযুক্ত ক'রে দিলেন অগ্রজ সুশীল। তবু সে বারও অকৃতকার্যতার গ্লানি ও বেদনা সহ্য করতে হল তাঁকে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারটা সুকান্তর জীবনের একটা ব্যর্থতার দিক। স্বতন্ত্র ভাবে বেড়ে ওঠা তাঁর মনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা—যা সকলের জন্যে একই মাপের জামার মতো নির্ধারিত হয়ে আছে—অনধিগম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষত ছাত্রসুলভ নিয়মানুবর্তীতার অভাবই এ দিক থেকে কাহিল করেছিল তাঁকে। অথচ যে পরিবারের ছেলে তিনি সেখানে লেখাপড়া শিখে রোজগারের উপযুক্ত হয়ে ওঠাটাই সব থেকে স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। ফলে পরীক্ষাকে পাশ কাটিয়ে যাবারও উপায় ছিল না। অঙ্ককে এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ইচ্ছায়

শেষে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জুনিয়র কেম্ব্রিজের পাঠগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন তিনি।

প্রথম বার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরই টাইফয়েডে ভুগলেন। এই ভারী অসুখ থেকে উঠে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেবার সুযোগ তিনি পেলেন না—কেননা ১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে তখন কলকাতার বুকে শুরু হয়ে গেছে ইংরেজ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান।

সুকান্তর কবিতার সব থেকে বড় অনুপ্রেরণাই ছিল সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। দেশে অথবা বিদেশে যখন যেখানে ঘটেছে অন্যায় আর অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্যে শোষক আর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তখন তার মধ্যে থেকে কবিতার বিষয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন তিনি। এমনি ভাবে রচিত হয়েছে 'লেনিন', 'কাশ্মীর', 'ঠিকানা', 'রোম' ইত্যাদি কবিতা। এ ছাড়া অন্য যে সব কবিতা তিনি লিখেছিলেন জনগণের দুঃখ, আনন্দ, ক্ষোভ, আর বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে—তাও রচিত হয়েছিল একটি ধ্রুব উদ্দেশ্যকে সফল করতে। সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, দেশের বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের মানুষ যখন তার বহু আকাঙ্খিত মুক্তির জন্যে শেষ বারের মতো জ্বলে উঠলো, তখন সুকান্ত যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পেলেন তাঁর মহমানবের সন্ধান।

১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সাল জুড়ে কলকাতার বুকে যতগুলি বড় বড় গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছেন সুকান্ত। '৪৫-এর ২১শে

নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে ধর্মতলার ছাত্র-মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তিনি, ছিলেন '৪৬-এর ভিয়েৎনাম-মুক্তি-দিবসের ছাত্র-অভিযানেও। ২৯শে জুলাই-এর ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটের পর বিজয়োৎসবে মেতেছেন, আবার রশিদ আলি দিবসের পথযুদ্ধে দেখেছেন রাজাবাজারের মুসলমান যুবক ও কিশোরদের উদ্ধত প্রতিরোধ। এই দিনগুলি তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম স্মৃতি। নিজের চোখে দেখা প্রতিটি সংগ্রামের পুংখানুপুংখ বর্ণনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন সুকান্ত। জনগণের এই সাহসিক অভিযানের দিনগুলো যেন পাখার ওপর ভরকরা পাখির মতোই উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে—তাঁর জীবনে আর জাতির মননে একই সঙ্গে এসেছিল আঠারো বছর বয়সের উদ্দামতা। ঐ বছরটি তাই তাঁর কবিতায় দেখা দিল প্রতীক হয়ে। সুকান্ত লিখলেন :

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

কিন্তু আশ্চর্য! সাধারণ মানুষের এই বিপ্লবী অভিযানকে গুণ্ডামী বলে তিরস্কার করার মতো নেতাও ছিল ভারতবর্ষের মাটিতে।

তাদের সেই ঔদ্ধত্যের জবাবে জনগণের পক্ষ থেকে দুরন্ত শ্লেষে ঘোষণা করলেন সুকান্ত :

> মুখে-মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের
> ভূমিকা চাইনা। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
> গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা
> হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা
> শোনো হুংকার কোটি অবরুদ্ধের।

ডাক দিলেন :

> হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কতকাল ?
> সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল ;
> তুমি কোন্ দলে ? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
> 'গুণ্ডা'র দলে আজো লেখাওনি নাম ॥

জাতীয় আন্দোলনের দিনগুলো অবিমিশ্র আনন্দের ছিল না সুকান্তর কাছে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনের ঠিক আগেই বাংলা দেশের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক কুৎসা রটনা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন তাদের সচেতন সিদ্ধান্তকে বিকৃত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইংরেজতোষণ। অথচ কে না জানে যুদ্ধান্তের দিনগুলিতে কলকাতার রাজপথে পতাকা হাতে সব থেকে সামনের সারিতে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের অন্যতম হল কমিউনিস্টরা। তাই রাজনৈতিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সুকান্তর 'বিক্ষোভ' মূর্ত হল তার স্বভাবসুলভ অভিমানে ; কেননা কমিউনিস্টদের অপবাদকে তাঁর ব্যক্তিগত অপমান বলেই মানতেন তিনি :

যারা আজ এতো মিথ্যার দায়ভাগী
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি,
কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ, কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল;
ততো দিন প্রাণ দেবো শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ॥

দেশব্যাপী উত্তেজনার দিনগুলির মধ্যেই ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুকান্ত। তাঁর এই অসুস্থতার গোড়ার দিককার ইতিহাস পরে বন্ধু অরুণাচলকে নিজেই জানিয়েছিলেন একটি চিঠিতে: '...আমার খবর: শরীর-মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময়। (ভয় নেই আঘাতটা প্রেম ঘটিত নয়)। আজ কাল অন্য দিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালমতো, একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু-পরিবর্তন ঘটোন

আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি, তাই ভিতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ হৃদ্-যন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম।'…

সুকান্ত শয্যা নিতেন ঠিক সেই মুহূর্তেই যখন তাঁর ঘুরে বেড়াবার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকতো না। ফলে ধীরে ধীরে শরীর তাঁর চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আত্মীয় স্বজনেরা এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করতে কুণ্ঠিত হন নি কোন দিনই, কিন্তু যে-সুকান্তর 'হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা : পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী', সে কেমন ক'রে বাঁধা থাকবে ঘরের কোণে, নিজের ভঙ্গুর শরীরের সামান্যতাকে আগলে, বিপ্লবের ডাকে সাড়া না দিয়ে ?

শরীরের ব্যাপারে ভূপেন একবার তিরস্কার করলে, সুকান্তই তাঁকে চটিয়ে দিয়েছিলেন উল্টে। কিন্তু ক-দিন পরেই একটি চিঠিতে নিজের ভুল স্বীকার ক'রে লিখেছেন : 'ডাক্তারের নিষেধ সত্বেও ক-দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে-ওখানে, যার ফলে কাল রাত্রিতে অনেক দিন পরে জ্বর এলো। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে—ডাক্তারের কথা মতো পরিপূর্ণ বিশ্রাম আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মতো ঘোরাফেরা। …আশা করছি দু-ব্যাপারেই তুই আমাকে নির্দোষ মনে করবি।'

কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র রেড-এড কিওর হোমে রেখে চিকিৎসা করানোর উদ্দেশ্যে নারকেলডাঙার বাড়ি থেকে সুকান্তকে নিয়ে গিয়েছিলেন ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর

ভট্টাচার্য। রেড-এড কিওর হোম তখন পার্কসার্কাস অঞ্চলের ১০ নম্বর রাউডন স্ট্রীটে। সেখানে পরিচিত সহকর্মীদের মধ্যে থেকে, এবং পার্টির চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে এক রকম ভালোই ছিলেন সুকান্ত। কেবল মনোলোকে স্বস্তি ছিল না তাঁর। কেননা ইতিমধ্যে কলকাতার বুকে শুরু হয়ে গেছে আত্মঘাতী দাঙ্গা। সেবার শারদীয় 'স্বাধীনতা'র জন্যে 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন সুকান্ত, তাতে দাঙ্গার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক বেদনা ও মানসিক চাঞ্চল্য খুবই পরিস্ফুট। দাঙ্গার দিনগুলির মর্মান্তিক স্মৃতিকে পরিহার ক'রে কবিতাটির শেষে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন—'জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে।' হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ম্রিয়মান তাঁর মনের আর্দ্রতা আরও গভীর ও অন্তস্পর্শী হয়ে দেখা দিয়েছে 'দেওয়ালী'র শুভেচ্ছার বিনিময়ে বন্ধু ভূপেনকে কবিতায় লেখা চিঠিটিতে :

তোর সেই ইংরেজিতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেইকো সুখ দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব,
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি :
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা কাঁদে নোয়াখালী।
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা।
তবু তোর রংচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে

পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
···এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে :
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রং, নেই রোশনাই
শুধু মাত্র ছন্দ আছে তাই দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই ॥

ভূপেনকে লেখা আর একটি চিঠিতে এই হাসপাতালে সুকান্তর দিনগুলো কেমন কেটেছিল তার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় তাঁর মনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য : '···এবার আমার কথা বলি। তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি—আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অঞ্চলটা পার্কসার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই।

এক রকম বৈচিত্র্যহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন—সেই একটা বৈচিত্র্য। সে দিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি এমন সময় কমরেড যোশী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে।

তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর এক জন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন—

'আমি আপনাকে ভীষণ ভাবে চিনি।' অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতোখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করিনি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যে দিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

হাসপাতালের ছককাঠা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকালের ঝক্‌মকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহৌসী স্কোয়ারের আপিসে বসে কোন দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর—কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ্য; শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়—দিন।

রেডিও, বই, খেলাধুলো—সময় কাটানোর অনেক উপকরণই আছে, আমার কিন্তু সব চেয়ে দেবদারু গাছে রোদের ঝিকিমিকিই ভালো লাগছে। উড়ে যাওয়া বাইরের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বাতাসকে মনে হয় খুবই উপভোগ্য। এমনি চুপ ক'রে বোধ হয় অনেক যুগ অনেক শতাব্দী কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

জীবনের শেষ দিনগুলো কেমন কেটেছিল সুকান্তর? কিছু দিন পরই রেড-এড কিওর হোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন তিনি। প্রতিদিন তখন থার্মোমিটারে জ্বর লক্ষ্য করতেন আর ডাক্তারের নির্দ্দেশানুসারে শুয়ে বসে সময় কাটাতেন কোনক্রমে। কিওর হোমের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন তখনও। অন্যান্য লক্ষণ থাকলেও ফুস্‌ফুসে টি. বি.-র চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে পেটের গোলোযোগ দেখে তার চিকিৎসাই করছিলেন তাঁরা। আইরন আছে এমন ট্যাবলেট খেতে হ'তো সুকান্তকে; আর সে-ট্যবলেট খেলেই অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তেন তিনি—চোখে জল এসে যেত পর্যন্ত।

এই দিনগুলিতেও কিন্তু সাহিত্যচর্চা চলেছে পুরোমাত্রায়। স্থানীয় সুবার্বন রিডিং ক্লাব থেকে ছোট ভাইকে দিয়ে প্রতিদিন দুটো ক'রে বই আনিয়ে নিয়ে সেই বই মুখে ক'রে কাটিয়ে দিতেন দুপুরগুলো। তা ছাড়া জগন্নাথ চক্রবর্তী'র কাছ থেকে কীট্‌স, শেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা আর শেকস্‌পীয়রের নাটক থেকে পাঠ নিতেন প্রায়ই—লিখতেন ছোট ছোট ইংরেজি নিবন্ধ। ইংরেজি ভাষাটাকে ভালো ভাবে আয়ত্তে আনার দিকে মন ছিল তাঁর।

বন্ধুরাও আসতেন তখনকার সেই দাঙ্গাজনিত কারফিউ-এর ফাঁকে ফাঁকে। প্রায়ই এসে গান শোনাতেন কবি সিদ্ধেশ্বর সেন; সহকর্মী মোহিত আইচ এনে দিতেন ছাত্র-আন্দোলনের নানা

খবর। তিনিও শোনাতেন তাঁর উচ্চ কণ্ঠের গান। আর প্রতিদিনই একটা ক'রে গল্প লিখে হাজির হতেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এই সব বন্ধুদের কোকো খাইয়ে তাঁর প্রিয় পানীয়টির প্রশংসা করতে ভালবাসতেন সুকান্ত।

কবিতা লেখাও চলছিল যথারীতি। তাঁর শোবার খাটের ওপর বসেই ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বরের বিপ্লবী দিনটিকে স্মরণ ক'রে তার ওপর কবিতা লিখে একটি ছাত্রসভায় পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন মোহিত আইচকে। এ সময় তাঁর লেখা যেন ক্রমে ক্রমে একটা স্বতন্ত্র ধারায় উৎসারিত হচ্ছিল। শয্যাশায়ী সুকান্ত যেন এক বিশেষ সংবেদনশীল মানসিকতায় উন্নীত হয়েছিলেন। অতি-সাধারণ বস্তুর মধ্যেও তখন কবিতার বিষয়কে খুঁজে পেতে দেরি হতো না তাঁর। বাড়ির রেলিং-ভাঙা সিঁড়িটাকে লক্ষ্য করে লিখলেন 'সিঁড়ি' কবিতাটি, আর ছাদের এক কোণে যে অশত্থ চারাটা দিনে দিনে পুরনো বাড়ির গাঁথনি দীর্ণ করছিল তার প্রেরণায় 'চারাগাছ'। 'চিল' ও 'সিগারেট' কবিতায় এই প্রতীকধর্মী কবিতার সূত্রপাত ঘটেছিল আগেই। কিন্তু এ সময় তিনি অপর যে দুটি কবিতা লিখেছিলেন তার বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। 'একটি মোরগের কাহিনী'তে লক্ষিত হয় দৃপ্ত ব্যঙ্গ; অন্য দিকে, 'প্রার্থী'তে শোনা যায় সুকান্তর গভীরতম আর্তি। তাঁর জীবনের শেষ শীতের স্মারক হয়ে থাকলো ঐ 'প্রার্থী' কবিতাটি।

বাইরে আত্মঘাতী দাঙ্গার বিষাক্ত নিঃশ্বাস বইছে অবিরাম। বেলেঘাটায় চব্বিশ ঘণ্টা কিংবা আট চল্লিশ ঘণ্টার কারফিউ তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে সুকান্তর চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছিল

নানা ভাবে—শহরের ডাক্তার এসে দেখে যেতে পারতেন না নিয়মিত, ওষুধ কিনতে দেরি হতো দু-এক দিন। বাইরে থেকে সুকান্তর সামান্য জ্বর দেখে তাঁর বাবা ঠিক করলেন এ জ্বর দুর্বলতাজনিত, ছেলেকে নিয়ে যাবেন বায়ু-পরিবর্তনে। কিন্তু সুচিকিৎসার অভিপ্রায়ে সুকান্তকে শেষ পর্যন্ত শ্যামবাজারে নিয়ে গেলেন জেঠাতুত ভাই মনোজ। এখানে ধরা পড়লো, ইন্‌টেস্টিনাল টি. বি.।

সুকান্তর অসুখের খবরে সাড়া জাগলো—কবিকে বাঁচাতে হবে। এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী অলকা উকিলের সহযোগিতায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে টাকা তুলতেও দেরি হল না তাঁর। বিলম্বে হলেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও অন্যান্যেরা সুকান্তর চিকিৎসার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন তখন—চেষ্টা চলছিল তাঁকে আজমীড়ের একটি স্যানিটোরিয়ামে পাঠানোর।

সুকান্তর অসুখ বাংলা দেশের সুধীজনদের কতখানি উদ্বিগ্ন করেছিল তা অনুমান করা যায় বিষ্ণু দে-র লেখার এই উদ্ধৃতিটুকু থেকে: '…তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালুম সুকান্তর অসুখের কথা, অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না শুনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়ে টাকা তোলার কথা বললেন। যামিনী রায় মহাশয় বললেন, ডাক্তার রাম অধিকারীকে নিয়ে যাবেন…। সুকান্তর কথা বলতে গিয়ে যামিনী দা বলে উঠলেন, ওর মতো' ছেলেরা সব বাংলা দেশে মরে যাবে, তবে যদি দেশের লোকের যন্ত্রণা কাজে পরিণত হয়।

আমাদের উচিত ওকে বাঁচানো কিন্তু ওরা সব মরে গিয়ে যদি দেশকে বাঁচায়।'…

শ্যামবাজারে ডাক্তার রাম অধিকারী সুকান্তকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন ডাক্তার তাপস বোস। সেখানে সুকান্ত ছিলেন তাঁর মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে, মেজবৌদির শুশ্রূষাধীন। যত্নে এবং পারিবারিক আবহাওয়ায় মনও ছিল ভালো। এখানেও বন্ধুবান্ধবদের অনেকে দেখে যেতেন তাঁকে, চিঠিতে জানাতেন শুভেচ্ছা। ছাত্রনেত্রী অলকা মজুমদার উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন একটি দামি কলম, রমাকৃষ্ণ মৈত্র দিয়েছিলেন লুই আরাগঁ-র ইংরেজিতে সদ্য প্রকাশিত কবিতা ও অন্যান্য রচনার একটি সংকলন। রাশিয়ার এক যুব-প্রতিনিধি দলের নেতা ওলগা জেৎচেৎকিনা এসে দেখা করেছিলেন সুকান্তর সঙ্গে। দেশে ফিরে ওলগা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে বই লেখেন তার একটি অধ্যায় জুড়ে আছে সুকান্তর কথা। শ্যামবাজারের এই বাড়ি থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে। এখান থেকে যাবার আগে আলমারিতে লুকিয়ে একটা মোড়ক রেখে গিয়েছিলেন সুকান্ত। পরে মোড়কটি খুলে পাওয়া গিয়েছিল তারাশঙ্করের 'ধাত্রী দেবতা'—মেজবৌদিকে সুকান্তর কৃতজ্ঞ উপহার।

সেই তরুণ বয়সে দুরন্ত ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামরত সুকান্তর সব থেকে বড় সান্ত্বনা ছিল দেশের লোকের ভালবাসা। সুকান্তকে জীবনের আশ্বাস দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কবিতা লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার :

'আমরা চাঁদা তুলে মারবো সব কীট ;
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা ।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইয়ে জয়গান ?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত ।'

হঠাৎ চারদিক থেকেই স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। পৃথিবীর নানা ভাষায় তখন তাঁর কবিতা ছাপা হচ্ছে। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি সংকলনে কনিষ্ঠ কবি হয়েও স্থান পেয়েছেন তিনি। 'দি বুকম্যান' প্রকাশনী থেকে তাঁর প্রথম কবিতার বইও ছাপা হচ্ছে দ্রুততালে, চারজন বিশিষ্ট কবির একটি ছড়ার সংকলন 'ঘুমতাড়ানী ছড়া'র জন্যে সুকান্তর লেখা নিয়েছেন 'ইণ্টার ন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস'।

যাদবপুর টি, বি, হাসপাতালের এল. এম. এইচ ব্লকের ১ নম্বর পেয়িং বেডের রোগী ছিলেন সুকান্ত। ওখানকার ব্যবস্থা তাঁর মনের পক্ষে হল মর্মান্তিক। ডাক্তারকে অনুরোধ জানালেও তিনি সময় দিতেন না রোগীর শারীরিক অবস্থা জানতে। আর নার্সদের তো কথাই নেই। কতগুলো পরুষ জীব, যারা পয়সা ছাড়া কিছুই চেনে না, সেখানে নিযুক্ত ছিল শুশ্রূষার কাজে। সুকান্তর পরিবার থেকে বাবা দাদা যখন

যেত নিয়মিত টাকা দিয়ে আসতো এদের তুষ্ট করতে। তবু এরা রোগীর যত্ন নিত না ঠিকমতো। অথচ এদের ক্ষুব্ধ করতেও ভয় পেত সকলে—পাছে সুকান্তকে একেবারেই না দেখে।

এমনি এক পরিবেশে সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকতে হতো সুকান্তকে। বিকেলে কেউ দেখা করতে এলে আনন্দে অধীর হতেন তিনি। সব থেকে অস্বস্তিকর ছিল সেই দিন, যে দিন এ. পি. দেওয়ার দরুন কথা বলা থাকতো নিষিদ্ধ অথচ সামনে পেতেন ঘনিষ্ঠ কোন একজনকে। যাঁরা যাদবপুরে সুকান্তকে দেখতে যেতেন তাঁদের মধ্যে আত্মীয়-বন্ধু ছাড়াও ছিলেন ছাত্রকর্মী থেকে প্রবীন সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত।

এখানে শুয়ে শুয়েও সুকান্ত স্বপ্ন দেখতেন—তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। মৃত্যুর ক-দিন আগে তাই বলেছিলেন কেবিন নিয়ে জেঠাইমাকে কাছে এনে রাখবেন। দু দিন আগেও ছিল বাঁচবার উজ্জ্বল বাসনা, মুখে সুন্দর স্বাভাবিক হাসি। তাঁর প্রকাশিতব্য কবিতার বই-এর ছাপা কয়েকটি ফর্মা হাতে নিয়ে দেখিয়েছিলেন ছোট ভাইকে তাঁর—প্রথম কবিতার বই বের হল বলে! কিন্তু সে বাসনা অপূর্ণই থেকে গেল। একটি বৈশাখী সকালে যখন জানালার বাইরের সবুজ মাঠটায় উজ্জ্বল রোদ সবে এসে উঁকি দিয়েছে, সুকান্তর মৃত্যুকে আবিষ্কার করা হল। সে দিনটি ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ।

দাঙ্গার দরুন কোন শোকযাত্রা বের করা সম্ভব হল না। গাড়ি ক'রে কাশী মিত্র ঘাটে এনে যখন তাঁকে দাহ করা হয়েছিল, সেই ধূসর সন্ধ্যায় সেখানে শোকার্ত মানুষের অভাব ঘটেনি। যারা তাঁকে ভালবেসেছে আপন বলে, যারা তাঁর মধ্যে দেখেছে ভবিষ্যৎ, প্রত্যেকেই সেদিন গঙ্গার তীরে ডুবন্ত সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রূঢ় এক বাস্তবের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই বিহ্বল মুহূর্তগুলো অনেক পিছনে ফেলে এসে আজও আমাদের সকলের মনে যে কথা উঁকি দেয় তা হল কবি অরুণ মিত্রের ভাষায়, 'মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসে ঢুকতে পারতো।'